মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

জানুয়ারি ২০২৬
পৌষ-মাঘ ১৪৩২
রজব-শাবান ১৪৪৭
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০৪

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩

দারসুল কুরআন

ভোটের শার'য়ী দৃষ্টিভঙ্গি
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৫

চিন্তাধারা

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের ভাবনা
আবুল আসাদ ॥ ১৫

ইসলাম গণতন্ত্র ও নির্বাচন
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী ॥ ২৫

অপবাদ গালিগালাজ ও চেহারা বিকৃতি
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৩৭

আগামী দিনের জীবন বিধান
সাইয়েদ কুতুব ॥ ৪৯

আন্তর্জাতিক

বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন ব্রাজিল
মীযানুল করিম ॥ ৫৪

প্রশ্নোত্তর ॥ ৬১

বই পরিচিতি

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন ॥ ৬৪

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫

সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

বর্ষ বিদায় বর্ষবরণ

পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে সময় চলে যাচ্ছে এবং এভাবেই দিন, সপ্তাহ, মাস ও বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে। এক সময় সময়ের গতি থেমে যাবে, আর তখনি এ দুনিয়া নি:শেষ হয়ে যাবে এবং কিয়ামাত সংঘটিত হবে। সুতরাং কালের আবর্তন, বছরের শুরু ও শেষ হওয়া অর্থহীন অথবা নিছক খেল তামাশা নয়। বরং মানব জীবনের জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রত্যেকের জীবনকাল বা সময়কাল নির্দিষ্ট। এ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাকে তার উপর অর্পিত গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে। আবার মৃত্যুর পর তাকে তার দায়িত্ব পালনের সফলতা বা ব্যর্থতার জবাবদিহি করতে হবে এবং সে আলোকে ভালো বা মন্দ প্রতিদানও ভোগ করতে হবে। সুতরাং সময়, দিন, মাস, বছর প্রভৃতি কেন আসে, কেন যায় এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? তা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

স্থান ও কাল আমাদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের সাক্ষী। কারণ এগুলোকে আশ্রয় করেই আমরা জীবন ও কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি। আমাদের জীবনের মূল পুঁজি হলো সময়। পৃথিবী নামক স্থানে প্রতিটি প্রাণি জন্মের মুহূর্ত থেকে প্রতিনিয়ত সময়ের স্রোতে ভেসে প্রলয় সমুদ্রের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। যে পরিমাণ চলছে, সে পরিমাণ জীবনের পুঁজি নি:শেষ হচ্ছে। এভাবেই প্রতিটি জীব সসীম জীবনকাল থেকে অসীম ও অনন্ত জীবনে পাড়ি দিচ্ছে। আদিকাল থেকে এভাবেই চলে আসছে এবং কিয়ামাত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।

মাঝখানের সময়টুকুই দুনিয়ার জীবন। এ জীবনে যার আমল আল্লাহ ও রাসূল (সা.) নির্দেশিত পথে হবে, তার পরকালীন জীবন সুখময় হবে। পক্ষান্তরে এ জীবনে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূল (সা) নির্দেশিত পথে চলবে না, সে ব্যক্তির পরকালীন জীবন হবে দুঃখময়। এজন্যই হাদীছে দুনিয়াকে আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানবজাতি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎ কাজ করেছে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আল আসর)

আমরা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে উপনীত হয়েছি। এ মাস শেষ হলে আমাদের জীবন থেকে একটি বছর শেষ হয়ে যাবে। শুরু হবে ২০২৬ সাল, আরেকটি বছর শেষ হওয়ার সূচনাকাল।

বর্ষ বিদায় এবং বর্ষ বরণের জন্য প্রতি বছর ঘটা করে 'থার্টি ফার্স্ট নাইট' উদযাপন করা হয়। আলোক সজ্জা, পটকাবাজী, নারী পুরুষ মিলে হৈ হুল্লোর, নাচ, গান ইত্যাদিতে মত্ত থেকে সারা রাত কাটিয়ে দেয়া হয়। এগুলো করতে গিয়ে দুর্ঘটনা এবং নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটেছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা বারো...

সুতরাং তোমরা সেগুলোতে নিজের প্রতি জুলুম করো না অর্থাৎ পাপাচার করো না।" (৯, সূরা আত্ তাওবা : ৩৬) এগুলো মূলতঃ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। ইসলামের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। তাই মুসলিমদের এগুলো থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

ইসলামে জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী, বর্ষ বিদায় বা বর্ষ বরণের অনুষ্ঠান পালনের কোনো দিক নির্দেশনা নেই। রাসূলুল্লাহ (সা), সাহাবায়ে কেরাম, তাবে'ঈন, তাবে তাবে'ঈন বা কোনো ইমাম এগুলো পালন করেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আরবী বা হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররাম এবং শেষ মাস জিলহাজ্জ। হাদীছে এ দু'মাসে কিছু 'আমলের কথা বলা হয়েছে। মুহাররাম মাসের ১০ তারিখকে আশুরা বলা হয়। এদিন এবং এর আগের বা পরের একদিন যোগ করে রোযা পালন করতে বলা হয়েছে। এ রোযা পালন করলে এক বছরের গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে হিজরীর শেষ মাস জিলহাজ্জের নয় তারিখ, আরাফার দিন। হাদীছে বলা হয়েছে, আরাফার দিনে কোনো ব্যক্তি রোযা পালন করলে তার এক বছরের পূর্বের ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

মুসলিমগণ বর্ষ বরণ করবে 'ইবাদাতের (রোযার) মাধ্যমে এবং বর্ষ বিদায়ও দেবে 'ইবাদাতের (রোযার) মাধ্যমে। বর্ষ শুরুতে তারা গুনাহ না করার সংকল্প করবে এবং বর্ষ শেষ করবে 'ইবাদাত ও রোনাজারির মাধ্যমে বিগত বছরের গুনাহসমূহ মাফ চাওয়ার মধ্য দিয়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বার্ষিকী, বর্ষবরণ প্রভৃতি ইসলামের সংস্কৃতি নয়। তাই সেগুলো থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। ■

আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

ভোটের শার'য়ী দৃষ্টিভঙ্গি

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}

অনুবাদ: 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহকে সেগুলোর হকদারের নিকট পৌঁছে দিতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা', [আন্- নিসা- ৪: ৫৮]।

নামকরণ: সূরাটির প্রথম আয়াতে উল্লেখিত نِسَاء (নিসা) শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ সূরায় নারী অধিকারের ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল: আলোচ্য আয়াতটি ব্যতীত এটি একটি মাদানী সূরা, [তাফসীরুল কুরতুবী ৫/১, । হিজরী ৩য় সনের শেষ ভাগ হতে ৪র্থ হিজরীর শেষ বা ৫ম হিজরীর প্রথমভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। আলোচ্য আয়াতিটি নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট এই যে, জাহিলী যুগের কা'বা ঘরের সেবা করা এবং এর জন্য দায়িত্ব পাওয়াকে মর্যাদার কাজ মনে করা হত। এসবের মধ্যে কা'বা ঘরের চাবি সংরক্ষণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার দায়িত্ব ছিল 'উসমান ইবন তালহার উপর। মাক্কা বিজয় হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'উসমানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে নিলেন। তবে একটু পরে তিনি 'উসমান ইবন তালহাকে ডেকে বায়তুল্লাহর চাবি তার হাতেই দিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কিয়ামাত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে যালিম ও অত্যাচারী হবে'। অর্থাৎ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেয়ার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না, [মু'জামুত

তাবারানী১১/১২০, তাফসীরুল বাগাভী ১/৬৪৮, তাফসীরুল কুরতুবী ৫/২৫৫, ইবন কাসীর ২/৩৪০]।

মূলবক্তব্য: সকল মানুষ একই উৎস হতে সৃষ্ট, সকল মানুষ সমান। নারী অধিকার, নারী বিষয়ক বিভিন্ন বিধি– বিধান, ইয়াতীমের অধিকার, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পারস্পরিক সম্পর্ক, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ আমানতসমূহকে যথাযথ হকদারদেরকে আদায় করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا** 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহকে সেগুলোর হকদারের নিকট পৌঁছে দিতে'। অর্থাৎ যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত যথাযথ হকদারকে পৌঁছে দেয়া তার জন্য অপরিহার্য। এ আয়াতটি আল–কুরআনের একটি সার্বজনীন আয়াত; কেননা এ আয়াতটি দীন ও শারী'য়াতের সমস্ত হুকম– আহকাম ও বিধি–বিধানকে শামিল করে, [তাফসীরুল কুরতুবী ৫/২৫৫]। উল্লেখিত আয়াতে **الْأَمَانَاتِ** শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে, **الْأَمَانَة**। এর অর্থ দায়িত্ব পালন করা, আনুগত্যপুরণ করা, সম্পন্ন করা। এর বিপরীত হচ্ছে, খিয়ানত করা, বিশ্বাসঘাতকতা করা। আর শারী'য়াতের পরিভাষায়, আমানত হলো, **كُلُّ مَا عَهِدَ بِهِ إِلَى الإِنْسَانِ مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ وَغَيْرِهَا** অর্থাৎ শারী'য়াতসহ অন্যান্য যত বিষয় ও বিধি– বিধান মানুষের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে এ সবই আমানত। কেউ কেউ বলেছেন, এমন প্রতিটি অধিকার যা একজন ব্যক্তির অবশ্যই পূরণ করা ও সংরক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। আর যা পূরণ না করলে ব্যক্তি শাস্তি ও তিরস্কারের উপযুক্ত হয়। একবচনে 'আমানত' শব্দটি এক বারই সূরা আল–আহযাবের ৭২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। শব্দটির বহুবচনে এ আয়াতসহ অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}

'আর যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে', [আল–মু'মিনুন– ২৩: ৮, আল–মা'আরিজ– ৭০: ৩২]। আমানত শব্দের বহুবচন ব্যাবহার করার মধ্যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমানতের যাবতীয় প্রকার এর মধ্যে শামিল হয়। আল্লাহর হক এবং বান্দার সব কিছুই এর অন্তর্ভূক্ত, [তাফসীরুল কুরতুবী ১৪/২৫৩– ২৫৪, ফাতহুল কাদীর ১/৫৫৫]। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে, শারী'য়াতের যাবতীয় আহকাম; ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ বিষয়াদি থেকে নিজেকে রক্ষা করা। বান্দার হকের মধ্যে টাকা– পয়সা, ধন– সম্পদ ইত্যাদি কারো কাছে গচ্ছিত রাখা। প্রাপকের তা প্রত্যার্পণ করা বাধ্যতামূলক। এমনকি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাছে গোপন কথা বললে শারী'য়াতসম্মত অনুমতি ব্যতীত তা অন্যের কাছে প্রকাশ করা বৈধ নয়। এটা আমানতের সুস্পষ্ট খিয়ানত। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ

‘যখন কোন ব্যক্তি কোন কথা বলে, অতঃপর সে এদিক ওদিক তাকায় সে কথাটি আমানত’, [সুনান আবি দাউদ ৪/২৬৭, নং ৪৮৬৮, সুনানুত তিরমিযী ৩/৪০৫, নং ১৯৫৯, হাদীসটি হাসান]। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তার কথা বলার সময় এদিক ওদিক তাকায়, কারণ তার এ কথাটি শুনে ফেলে নাকি সে ভয় থেকেই সে এমনটি করে। তাই এ কথাটি একটি আমানত। এটাকে অন্যের কাছে ফাঁস করা নিষিদ্ধ।

ইসলামে আমানত আদায়ের গুরুত্বঃ উপর্যুক্ত আয়াতে আমানত তার হকদারদের কাছে আদায় করার বিষয়ে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী বিধানে আমানত তার প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আমানত আদায় করা দীনের একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং ঈমান পরিপূর্ণতার অন্যতম প্রমাণ। আমানতের এই দায়িত্ব আসমান, যমীন ও পাহাড়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তারা তা বহন করতে অক্ষমতা কথা বলেছে। কিন্তু মানুষ সেই কঠিন দায়িত্ব বহন করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}

‘নিশ্চয় আমরা আসমান, যমীন ও পাহাড়ের প্রতি এ আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা এটা বহন করতে অস্বীকার করল এবং তাতে শংকিত হল, আর মানুষ তা বহন করল; সে অত্যন্ত যালিম, খুবই অজ্ঞ’, [আল–আহযাব– ৩৩: ৭২]। আয়াতের ‘আল–আমানাহ’ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত রয়েছে; দীনের যাবতীয় কর্ম ও কর্তব্য এই আমানতের অন্তর্ভূক্ত। শারী‘য়াতের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধের সমষ্টিই হচ্ছে আমানত। সার কথা হলো, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশসমূহ পালনকে ‘আমানত’ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এ আমানত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও ভারী সে ধারণা দেবার জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন যে, আকাশ ও পৃথিবী তাদের বিশালত্ব এবং পাহাড়– পর্বত তার বৃহদাকার দেহাবয়ব সত্ত্বেও তা বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখেনি অথচ মানুষ দুর্বল শরীর ও ক্ষুদ্রতম প্রাণের উপর এই ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, মানুষ নিজের প্রতি যুলমকারী এবং নিজের পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ, [তাফসীরুল বাগাভী ৩/৬৬৩, তাফসীরুল করুতুবী ১৪/২৫৩, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ২/২১৭২– ২১৭৩]। মহান আল্লাহ আমানতের খিয়ানত করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

‘ হে ঈমানদারগণ! তোমরা জেনে– বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খিয়ানত করো না

এবং তোমারেদ পরস্পরের আমানতেরও খিয়ানত করো না', [আল–আনফাল– ৮: ২৭]। অর্থাৎ আল্লাহর আমানত বলতে ফারয, ওয়াজিব, হারাম ও মাকরুহ বুঝানো হয়েছে আর রাসূলের আমানত বলতে তার সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে, [ফাতহুল কাদীর ২/৩৪৫]। আর পরস্পরের আমানত বলতে সব দায়িত্বই বুঝানো হয়েছে, যা কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করে তার উপর ন্যস্ত করা হয়। তা ওয়াদা পুরণের দায়িত্ব হতে পারে, সামগ্রিক সামাজিক চুক্তি হতে পারে, কোন সংস্থার আভ্যন্তরীণ গোপন তথ্য হতে পারে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ধন–সম্পদ হতে পারে। কারো প্রতি বিশ্বাস করে জন–সমাজে যদি তাকে কোন দায়িত্বপূর্ণ নিযুক্ত করে তবে তাও এর মধ্যে শামিল হবে, [কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/৮৯৭]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আমানত যথাযোগ্য প্রাপকের কাছে আদায় করার ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন। আমানতদারী না থাকা মুনাফিকীর একটি 'আলামত। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকীর আলামত বলতে গিয়ে বলেন,

وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'আর যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খিয়ানত করে', সাহীহুল বুখারী ১/১৬, নং ৩৩, সাহীহ মুসলিম ১/৭৮, নং ৫৯]। আনাস (রা) বলেন, এমন খুব কম হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন আমাদের সামনে বক্তব্য প্রদান করেছেন অথচ তাতে এ কথা বলেননি যে,

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

'যার মধ্যে আমানতদারীতা নেই তার মধ্যে ঈমান নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার মানষিকতা নেই তার দীন নেই', [মুসনাদ আহমাদ ১৯/৩৭৬, নং ১২৩৮৩, হাদীসটি হাসান]।

আমানতের কিছু ক্ষেত্রসমূহ, (১) রাষ্ট্রীয় পদ– পদবী আমানত, রাষ্ট্রীয় যত পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ– বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা বৈধ নয় যে তার যোগ্য নয়। বরং প্রতিটি পদের জন্য সাধ্যানুযায়ী যোগ্য, আমানতদার, সৎ ও দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দান করেছেন। কারণ উম্মাতের জীবনে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বজনপ্রীতি করে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভসম্পাতযোগ্য, উপস্থিতদের মধ্যে যার যোগ্যতা, আমানতদারী ও সততা রয়েছে তাকেই নিয়োগ দিতে হবে। এমন ব্যক্তি পাওয়া সত্বেও পক্ষপাতিত্ব করে কাউকে নিয়োগ দিলে সে আল্লাহর লা'নত পাওয়ার

উপযুক্ত এবং তার ফারয ও নফল কোন 'ইবাদাতই কবুল হবে না। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন দায়িত্ব পেয়ে তাদের উপর তার ভালবাসার খাতিরে একজনকে নেতা নিয়োগ করে দিল তার উপর আল্লাহর লা'নত। আল্লাহ তার থেকে কোন ফারয ও নাফল আমল গ্রহণ করবেন না এমনকি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে', [মুসনাদ আহমাদ ১/২০২, নং ২১, আল–হাকিম, আল– মুস্তাদরাক ৪/১০৪, নং ৭০২৪, আল–হাকিম হাদীসটি সাহীহ বলেছেন]। ইবন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وخانَ رَسُولَهُ وخانَ الْمُؤْمِنِينَ

'যে ব্যক্তি কোন দল থেকে এমন কাউকে নিয়োগ করল যে দলে তার চেয়ে আল্লাহর প্রতি অধিক পরিতুষ্ট ব্যক্তি রয়েছে সে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের এবং মু'মিনদের সাথে খিয়ানত করল', [আল–হাকিম, আল– মুস্তাদরাক ৪/১০৪, নং ৭০২৩, আল–হাকিম হাদীসটি সাহীহ বলেছেন]।

আমনতের প্রকারভেদের অনেক বিষয় রয়েছে, যেমন, (২) 'ইবাদাতের ক্ষেত্রে; সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, দা'ওয়াত ইলাল্লাহ, জিহাদ ফী সাবিল্লিাহ, দীন কায়েম ইত্যাদি। (৩) দেহ ও দেহের অঙ্গ– প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমানত; এগুলোর আমানত রক্ষা করা আবশ্যক। এগুলোকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার না করা; চোখ আমানত, কান, হাত, পা, যৌনাঙ্গ, বুদ্ধি– বিবেক, জ্ঞান ইত্যাদি।

শারী'য়াতের দৃষ্টিতে ভোট প্রদানও আমানতের অন্তর্ভুক্ত, মানুষের সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমানত। এসব আমানতের হেফাযতের অর্থ এগুলোকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিথ পথে ও নিয়মে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হচ্ছে ভাল– মন্দ চেনার ক্ষমতা এবং তা চিনে ভালোটা গ্রহণ করা এবং মন্দটা বর্জন করা। এটাই 'আকলে সালীম বা সুষ্ঠু জ্ঞান ও বিবেক। তাই মানুষের পক্ষ নেয়া, সমর্থন করা, তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া সব কিছুই হতে হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পন্থায় ও অনুমোদন সাপেক্ষে। তাই ভোট দেয়া, সমর্থন করা, কোন কাজ আদায়ের জন্য কাউকে প্রতিনিধি নিয়োগ করাও আল্লাহর ও তাঁর রাসূল নির্দেশিত পথেই সম্পন্ন হতে হবে। ভোটেরও একটি শার'য়ী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে নিম্নে সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো;

ভোটও একটি বড় আমানত। ভোট অর্থ রায় প্রদান করা। আপনি দেশ ও জাতির

কল্যাণে যে ব্যক্তিকে রায়প্রদান করছেন সে যদি ভালো লোক হয়, জনগনের জন্যে ভালো কাজ করে তা হলে তার সমপরিমাণ সাওয়াব আপনিও লাভ করবেন। আবার কোন মন্দলোককে যদি আপনি আপনার ভোট, রায় বা সমর্থন দিয়ে থাকেন তা হলে এই ব্যক্তি যতো মন্দ কাজ করবে এর সমপরিমান মন্দের বোঝা আপনাকে বহন করতে হবে এবং দুনিয়তেও কোননা কোন সময় আপনাকে এর জন্য লাঞ্ছনা ভোগ কতে হবে এবং ঐব্যক্তির সমপরিমাণ শাস্তি আপনাকে ভোগ করতে হবে। বিশেষ করে কিয়ামাতের দিন আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাদারিতে থাকবেন না।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্বাচনের মাধ্যমে একটি দেশের সরকার গঠিত হয়। তাই ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে ন্যয়নিষ্ঠ সরকার গঠিত হয়। আবার আল্লাহদ্রোহী ও যালিম সরকার গঠিত হয়। তাই ভোট একটি পবিত্র আমানত। এমন আমানত যথাযথ ব্যক্তি, যোগ্য, দক্ষ, সৎ ও আল্লাহভীরু লোকদের দিতে হয়। তাই শরীয়ার দৃষ্টিতে ভোট দেয়া আবশ্যক। নিচে ভোট দেয়ার শারয়ী দৃষ্টিকোণ উল্লেখ করা হলো।

ইসলামী শরীয়াতে ভোট দেয়ার চারটি অবস্থান-

১. সাক্ষ্য দান

২. উকিল নিযুক্ত করা বা অর্পিত দায়িত্ব পালন

৩. সুপারিশ করণ

৪. আমানত

১. সাক্ষ্য দান: কোন পদের প্রার্থীকে উক্ত পদের জন্য ভোট দেয়ার মানে হল, ভোটার এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, প্রার্থী যে পদের আশা করছে সে পদের উপযুক্ত প্রার্থী। সুতরাং সে যদি উক্ত পদের কোরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে যোগ্য, সৎ, আমানতদার ও আল্লাহভীরু হয়, তবে তাকে ভোট দেয়ার জরুরী। জাতিকে যুলুম-নিপীড়ন থেকে বাঁচাতে এবং ইসলাম ও মুসলিমদেরকে যালিম ও আল্লাহরদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করতে ভোট প্রদান করা আবশ্যক। যুলুম ও ইসলামবিদ্বেষী কাজ থেকে নিরব বসে থাকার ব্যাপারে হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

'যদি লোকেরা যালিম ব্যক্তিকে দেখে তাকে বাধা না দেয়, তাহলে আল্লাহ তাদের সবার উপর আযাব নাযিল করতে পারেন। (সুনানু আবিদাউদ, হাদিস নং-৪৩৩৮, সুনানুত তিরমিযি, হাদিস নং-২১৬৮)

বস্তুত কোন পদের প্রার্থীকে উক্ত পদের জন্য ভোট দেয়ার অর্থ হল, ভোটদাতা এর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রার্থী যে পদের আশা করছে সে পদের উপযুক্ত প্রার্থী। সুতরাং যদি উক্ত প্রার্থী প্রার্থিত পদের উপযুক্ত না হয় তাহলে ভোটদাতা মারাত্মক গুনাগার হবে।

আল্লাহ বলেন,

وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى

"যখন তোমরা কথা বলো তখন সুবিচার করো, যদিও সে আত্মীয় হয়।" (সূরা আল আন'আম-১৫২)

وَ لَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّه اٰثِمٌ قَلْبُه.

আল্লাহ আরো বলেন, "তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ তা গোপন করে তার অন্তর পাপী হবে।" (সূরা আল বাকারা-২৮৩)

আল্লাহ আরো বলেন,

وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

"আর তোমরা মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকো"। (সূরা হাজ-৩০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ - الإِشْرَاكُ بِاللَّهِأَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ،

'আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলব? সাহাবীগণ বললেন হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা আর মিথ্যা সাক্ষা দেওয়া বা মিথ্যা কথা বলা।' (সহীহ আল বুখারী, হাদিস নং ৫৯৭৬, সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৪৩)

২. সুপারিশ করন : ভোটদাতা কোন প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অর্থ হল, ভোটার উক্ত ব্যক্তির প্রার্থিত পদের ব্যাপারে যোগ্য বলে সুপারিশ করছে। বস্তুত প্রার্থী যদি অযোগ্য, অসৎ ব্যক্তি হয়, তাহলে অন্যায় কাজে সুপারিশ করার কারণে ভোটার গোনাহগার হবে। উক্ত ভোটের কারণে নির্বাচিত হয়ে প্রার্থী যত খারাপ কাজ করবে এর গুনাহের ভাগীদার ভোটদাতা হবে।

আল্লাহ বলেন,

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّه نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّه كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيْتًا

"যে লোক সৎ কাজের জন্য সুপারিশ করবে তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে, আর যে লোক মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে সে তার গুনাহেরও একটি অংশ পাবে।" (সূরা আন নিসা-৮৫)

এ আয়াতে শাফা'আত অর্থাৎ সুপারিশকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি ভালো সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে এর কুফলের অংশ পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্য বৈধ সুপারিশ করবে, সে যেমন সওয়াবের ভাগিদার হবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্য অথবা অবৈধ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এই উৎপীড়িতের কিংবা বঞ্চিতের কার্যোদ্ধার করে

দেবে তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে। এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও গোনাহগার হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

" مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ " .

"যে ব্যক্তি কোন সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায়।" (সহীহ মুসলিম: ১৮৯৩) এ থেকে বোঝা গেল যে, সৎকাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা যেমন একটি সৎকাজ তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহের অধিকারী হওয়া । এ সবই হচ্ছে দুনিয়ার সুপারিশের বিষয়।

৩. উকিল নিযুক্ত করণ বা দায়িত্ব পালন: ভোটারের ভোট জাতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। ভোটার তার ভোট প্রদানের মাধ্যমে জাতির প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং নিজেরও প্রতিনিধি নির্বাচন করে। নিজের ও জাতির জিম্মাদার হিসেবে উক্ত মতামত পেশ করার সময় যদি দলীয় সংকীর্ণতা, স্বজনপ্রীতি, দল প্রীতি বা কারো প্রভাবের কাছে নতি শিকার করে তুলনামূলক যোগ্য, সৎ, আল্লাহভীরু ও ইসলাম প্রিয় প্রার্থীকে রেখে অযোগ্য, দেশ ও ইসলামের জন্য ক্ষতিকর প্রার্থীকে ভোট দেয়, তাহলে জাতির পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালনে একটি খেয়ানতকারী রূপে সাব্যস্ত হবে। দায়িত্বে অবহেলা বা স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাপারে হাদিসে কঠোর হুঁশিয়ারী রয়েছে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'যে ব্যক্তি মুসলিমদের পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল নিযুক্ত হয় তারপর সে তাদের ওপর কোন ব্যক্তিকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করে অথচ সে জানে যে মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যে তার চেয়ে অধিক যোগ্য ও কোরআন ও হাদিসের প্রতি জ্ঞান রাখে তবে সে অবশ্যই আল্লাহ তার রাসূল ও মুমিনদের সাথে খেয়ানত করল।' (আল মুজামুল কাবীর, লিত্ তাবারানী, ১১২১৬)

৪. আমানত : আলোচ্য আয়াতে আমানতগুলোর হকদারদের কাছে আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমানত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে শুরুতে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ ভোটও একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত। তাই তা সঠিক ও যোগ্য স্থানে প্রয়োগ করতে হবে। টাকা পয়সা ও অন্য কোন স্বার্থের বিনিময় তা অযোগ্য, অসৎ, দুষ্টুলোক ও ইসলামী বিধান বিদ্বেষী ব্যক্তিকে প্রদান করা সর্ব নিকৃষ্ট পর্যায়ের ঘুষ গ্রহণ। যা সুস্পষ্ট হারাম। তাই মুসলিমদের ইসলাম ও ইসলামী বিধি-বিধান বিরোধী ও বিদ্বেষী ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করা নিষিদ্ধ ও হারাম। অপরদিকে এটি আমানতেরও খিয়ানত, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের খেয়ানত করো না এবং মুমিনদের সাথেও করো না তোমাদের আমানত সমূহেরও খেয়ানত। অথচ তোমরা জানো।" (সূরা আল আনফাল: ২৭)

ভোটের বিষয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও ফিকই সংস্থাগুলোর মতামত

নানা কল্যাণ ও অনেক বড় ক্ষতির প্রতিরোধ বিবেচনায় নিয়ে কোন কোন আলিম গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক বলে মনে করেন। আর কোনো কোনো আলিম জায়িয মনে করেন। মুফতি মোহাম্মদ শফী রহ. 'জাওয়াহিরুল ফিক্হ' কিতাবে ভোট ইসলামের দৃষ্টিতে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি বলে মত দিয়েছে। ১. সাক্ষ্য প্রদান, ২. সুপারিশ ও ৩. প্রতিনিধিত্বের অথরিটি প্রধান।

সৌদি আরবের 'ফাতাওয়া লাজনাতিত দায়িমাহ' তে শরিয়া ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করার উদ্দেশ্যে বর্তমান নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে জায়েজ বলেছেন। (২৩/ ৪০৬-৪০৭)

সৌদি আরবের প্রখ্যাত শাইখ মুহাম্মদ ইবনু উসায়মীন রহ. কল্যাণ প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষতিরোধ করার লক্ষ্যে বর্তমানের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ওয়াজিব বলেছেন।

মহান আল্লাহর বাণী, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 'তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে',। আয়াতের প্রথমাংশে আমানত তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দেয়ার ও পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয়াংশে বিচারের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ এই আমানতের হক আদায় না হলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হওয়ার আদৌ সম্ভাবনা নেই। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। সরকারী পদ–পদবীতে সেসব লোককেই নিয়োগ দিতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে। কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সুপারিশ অথবা ঘুষ– উৎকোচ যেন কোনক্রমেই প্রশ্রয় পেতে না পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য অথর্ব, আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারী পদের অধিকারী হয়ে আসবে। অতঃপর শাসকবর্গ যদি একান্তভাবেও দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন তবুও তাদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, এসব সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের অঙ্গ– প্রত্যঙ্গ। এরাই যখন অন্যায় ও আত্মসাৎকারী হবে, তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আর কোন উপায় থাকবে না, [মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ২৫৯]।

মনে রাখতে হবে যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। রাষ্ট্র ও সমাজের যত পদসমূহ আছে এগুলো অধিবাসীদের অধিকার নয় যা সমভাবে বন্টন করতে হবে। বরং এগুলো হলো আল্লাহ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেয়া যেতে পারে। আর পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তাদের সকল আইন কানুন ও শাসন নীতি তা কেবলমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালা অনুসারেই হতে হবে। তাই শাসন বিচার সবকিছু আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ীই হতে হবে। সকল মানুষের জন্য ন্যায় সংগতভাবে মীমাংসা করা শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফারয। 'আলী

(রা) বলেন, শাসকদের উপর ফারয হলো, আল্লাহ বিধান অনুযায়ী বিচার করা, আমানত আদায় করা। যদি তারা সেটা করে তবে জনগণের উপর কর্তব্য হবে তার কথা শোনা, আনুগত্য করা, তার ডাকে সাড়া দেয়া, [তাফসীরুত তাবারী ৮/৪৯০, কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ '১/৪৩৯]।

আল্লাহর বাণী, إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশনা ও উপদেশই উত্তম। আল্লাহ সবকিছু জানেন। সুতরাং তাঁর নীতিমালা ও আদেশ– নিষেধই সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর। তাঁর বিধি– বিধানই চিরন্তন, সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে মানব রচিত আইন কানুন ও নীতিমালা শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ আয়াতে কারীমা থেকে আল্লাহর চোখ ও কান থাকা প্রমাণ করে। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত একটি হাদীসেও এর সমর্থন রয়েছে, [সুনান আবি দাউদ ৪/২৩৩, নং ৪৭২৮]।

শিক্ষাসমূহ:

১. আল্লাহ একমাত্র বিধানদাতা, আইন দাতা ও নিরংকুশ ইবাদত ও আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত ও অধিকারী। সকলের তা মেনে নেয়া আবশ্যক।

২. মানুষের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত সকল অনুগ্রহ আমানত, তা যথাযথভাবে আদায় করা মানুষের জন্য অপরিহার্য।

৩. সবচেয়ে বড় আমানত হচ্ছে আর কুরআন ও দীন ইসলাম। তাই কুরআন ও দীনের এই আমানতের হক যথাযথ আদায় করা কর্তব্য।

৪. মানুষের আরেকটি মূল্যবান আমানত তার মতামত ও ভোট। তাই ভোট দিতে হবে সৎ, যোগ্য, আমানতদার ও আল্লাহভীরু লোককে।

৫. ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ও আমানত আদায়ের দাবি। তাই সর্বত্র ইনসাফ কায়েম করা আবশ্যক।

আল্লাহ আমাদেরকে উক্ত শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের ভাবনা

আবুল আসাদ

আগামী মাস ফেব্রুয়ারিতে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

অনেক আশার এই নির্বাচন।

১৯২৪ এর জুলাই বিপ্লবে যে কুরবানী আমাদের ছাত্র-তরুণরা দিয়েছে, তার পরিসমাপ্তি অসম্ভব। দেড় হাজারেরও বেশি ছাত্র-তরুণ গুলির সামনে দাঁড়িয়ে জীবন দিয়েছে। হাজার হাজার আহত শিশু-কিশোর, ছাত্র-তরুণদের কেউ চোখ হারিয়েছে, কেউ চিরদিনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। শত শত পরিবার হয়েছে নিঃস্ব, অসহায়। এত বড় কোরবানির দাবি শুধু স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারকে তাড়ানো ছিল না। রক্তভেজা জুলাই বিপ্লবের সর্বান্তকরণ চাওয়া ছিল, রাষ্ট্রের আইন ও কাঠামোর এমন সংস্কার যাতে স্বৈরাচারী শাসন দেশে আর ফিরে আসতে না পারে এবং দেশের নিরাপত্তা ও জনগণের সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। কিন্তু অতীতে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া ও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পাগল রাজনৈতিক দল বিশেষের বাধার কারণে ঐক্যমত্যের মাধ্যমে দেশের আইন ও কাঠামোর সার্বিক সংস্কার সম্ভব হলো না। গণভোট ও সংসদ নির্বাচনের হাতেই ছেড়ে দেয়া হলো সবকিছু। এই কারণেই গণভোট ও সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই গণভোট ও নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসে।

অনেক আশার এই নির্বাচন সকলের জন্য, বিশেষ করে দেশপ্রেমিক জনগণের জন্য।

নির্বাচনে এবার প্রধান প্রতিপক্ষ তিনটি। এক. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, দুই. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তিন. জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। জাতীয় নাগরিক পার্টি জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ অথবা বিএনপি পক্ষের সাথে নির্বাচন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রধান পক্ষ হয়ে দাঁড়াবে দুইটি, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষের সাথে যুক্ত আছে জামাতসহ আটটি দল। অন্যদিকে বিএনপি পক্ষের সাথে যুক্ত আছে অনেকগুলো ছোট ছোট দল। আরো দল দুই পক্ষের সাথে যুক্ত হতে পারে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে এই দুই পক্ষের মধ্যে। দুই পক্ষের যেকোনো একটিকে জনগণ বেছে নিবে দেশ পরিচালনার জন্য। বাছাইয়ের জন্য দুই পক্ষের যে পরিচয় জনগণের কাছে থাকা দরকার তা জনগণের আছে। পক্ষ দু'টির পরিচয়ের উপর জনগণ তাদের বিবেচনা দাঁড় করাবে। সেই পরিচয়ের দিকটা তাই এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনে বিএনপি পক্ষের পরিচয়গত সুবিধা

(ক) বিএনপি জিয়াউর রহমানের দল। জিয়াউর রহমান দেশকে একদলীয় ষড়যন্ত্র থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে ফিরিয়ে এনেছিলেন। বিভাজনের বদলে জনগণের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জিয়াউর রহমান। বিভ্রান্তিকর বাঙালি নামের বদলে দেশের নাগরিকদের জন্য অর্থবহ বাংলাদেশী নামকরণ করেছিলেন। আর্থিক অসততা ও স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত থাকার এক বড় দৃষ্টান্ত ছিলেন জিয়াউর রহমান।

(খ) তিনবার ক্ষমতায় গেছে বিএনপি। রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে।

(গ) ক্ষমতায় যাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের মোকাবিলায় বিএনপি ছিল বিকল্প। নির্বাচনে বিএনপির ছিল এটা একটা বড় সুবিধা।

নির্বাচনে বর্তমান বিএনপি পক্ষের পরিচয়গত অসুবিধা

(ক) জিয়াউর রহমানের বিএনপি এবং বর্তমান বিএনপি এক নয়। জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশের বৃহত্তর (মুসলিম) জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার সাথে ছিলেন একাত্ম। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় বিনির্মাণে মেজরিটির জনগণের আদর্শ ও বিশ্বাস (ইসলামকে) তিনি ধারণ করেন। এজন্যই তিনি আওয়ামীলীগ প্রণীত সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন করেছিলেন। সংবিধানের শুরুতেই তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে) কথাগুলো সংযোজিত করেন। সংবিধানের মূলনীতিতে জিয়াউর রহমান 'বাঙালি জাতি' স্থলে 'বাংলাদেশি' জাতি, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বাতিল করে তদস্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং সমাজতন্ত্রের জায়গায় 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার' প্রতিস্থাপন করেন। বাংলাদেশী জাতীয়তার অর্থ জিয়াউর রহমান কি বুঝেছিলেন, সংবিধানের মূলনীতির এই পরিবর্তনগুলোই তা বলে দেয়। বর্তমান বিএনপি জিয়াউর রহমানের এই চিন্তা চেতনার ধারে কাছে নেই। জিয়াউর রহমান যে সমাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সে বাম-সমাজতন্ত্রীরা এখন বিএনপিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এমনকি বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মনে হচ্ছে পিতার আদর্শে নেই। জিয়াউর রহমান যেখানে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে' সংবিধানের মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে তারেক রহমান এই

'পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে' মৌলবাদ আখ্যা দিয়ে একে বাংলাদেশের জন্য সমস্যা বলে অভিহিত করছেন। জিয়াউর রহমান তার সরকারে মশিউর রহমান জাদু মিয়ার মত ডাকসাইটে বামপন্থীদের নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সাথে শাহ আজীজুর রহমানের মত আওয়ামী লীগের ভাষায় রাজাকার বা ইসলামপন্থীদের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী তিনি বানিয়েছিলেন। বর্তমান বিএনপি'তে শাহ আজীজ, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মত কেউ নেই। বিএনপি এখন বামপন্থীদের হাতে চলে গেছে এবং বামপন্থীরা এখন মস্কো, বেইজিং থেকে হতাশ হয়ে দিল্লির কোলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এদের কারণেই বর্তমান বিএনপি ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিত হয়েছে। বিএনপি'র নতুন পরিচয় ও পরিবর্তন ভোটারদের কাছে অগ্রহণযোগ্য।

(খ) জিয়াউর রহমানের অর্থনৈতিক সততা এবং দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি থেকে মুক্ত থাকার যে চরিত্র বর্তমান বিএনপি'র অধিকাংশের মধ্যে তা নেই। বিএনপি'র রাজনীতিকরা ক্ষমতায় যাওয়ার আগে তাদের অর্থের থলে এবং ক্ষমতায় যাওয়ার পরে তাদের অর্থের থলে ওজন পরিমাপ করলেই তা জানা যাবে। মাছের পচন ধরে লেজ থেকে কিন্তু মানব সমাজের পচন আসে সমাজের মাথায় বসা লোকদের থেকে। বিএনপি নেতাদের থলে ভরার দৃষ্টান্ত মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে তাদের দলের তৃণমূল পর্যায়ে। এদের মধ্যেই এখন চলছে দখল, চাঁদাবাজির মহোৎসব। তৃণমূল পর্যায়ের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে বহিষ্কারের মত কঠোর পদক্ষেপ নিয়েও তাদের থামানো যাচ্ছে না। বিএনপি'র এই চরিত্রের মধ্যে ভোটাররা আওয়ামী লীগকে দেখতে পাচ্ছে।

(গ) দেশ জুড়ে দুর্নীতি, দখলদারি ও চাঁদাবাজির অভিযোগ আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি'র জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় দেখা দিচ্ছে। মানুষ মনে করছে স্বজন প্রীতি, স্বার্থপরতা, ঘুষ, দুর্নীতি, দখলদারি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপরাধ দেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্রের অগ্রগতি, ন্যায্য দ্রব্যমূলকে বাধাগ্রস্থ করছে। এইসব অপরাধেই দেশের মানুষ আওয়ামীলীগকে ক্ষমতা থেকে তাড়িয়েছে। এখন তারা দেখছে আওয়ামী লীগের স্থান নিয়েছে বিএনপি। মানুষ এমনকি বলছে যে, ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই বিএনপি যে চাঁদাবাজি, দখলদারি শুরু করেছে ক্ষমতায় গেলে তারা আওয়ামী লীগকেও ছাড়িয়ে যাবে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে না পারায় ভোটের মাঠে বিএনপি একচ্ছত্র সুবিধা লাভ করবে বলে যে আশা করেছিল, সেটা আর হচ্ছে না। শহর, বন্দর, তৃণমূল পর্যায়সহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিএনপি'র দখলদারী ও চাঁদাবাজির শিকার সাধারণ মানুষের সাথে আওয়ামী লীগের লোকরাও হয়েছে যুক্ত। এর ফলে আওয়ামী লীগের ভোট বিএনপি হারাবে। এছাড়া বিএনপি'র বিরুদ্ধে দখলদারি, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি বদনাম ছড়িয়ে পড়ার ফলে বিএনপি'র অনেক নিজস্ব ভোটও বিএনপি পাবে না।

(ঘ) বিএনপি'র দেশ চালানোর অভিজ্ঞতা আছে, এই স্লোগান তুলেও বিএনপি খুব সুবিধা করতে পারবে না ভোটের মাঠে। বিএনপি'র প্রতিদ্বন্দ্বী হবে যারা, শিক্ষা ও যোগ্যতায় তারা নিশ্চয়ই কম হবে না। তাছাড়া এবার ভোটাররা অভিজ্ঞতার চাইতে প্রার্থীর সততা ও যোগ্যতার গুণকেই বেশি দেখবে।

(ঙ) বিএনপি'র প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে যে বাদ-প্রতিবাদ, মিছিল-মিটিং এবং যে ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তা বিএনপি'কে দুর্বল করবে, তাদের ইমেজ ব্যাপক হারে ক্ষুণ্ন করবে এবং তাদের দলীয় ভোটও বিভক্ত হবে। প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে বিএনপি'র মধ্যেকার বিতর্ক ইতিমধ্যেই দলটির অনেক ক্ষতি করেছে।

(চ) বিএনপি'র আওয়ামী লীগ ও ভারত কানেকশন ভোটের মাঠে বিএনপি'কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আওয়ামী লীগ ছিল ভারতের দল। আওয়ামী লীগকে হারিয়ে ভারত এখন বিএনপি'র ঘাড়ে সওয়ার হচ্ছে। আওয়ামী লীগকে ভারতে যেমন ক্ষমতায় রেখেছিল তেমনি তারা বিএনপি'কেও ক্ষমতায় রাখবে- এই টোপ ভারত বিএনপি'কে দিচ্ছে। ব্যাপকভাবে মনে করা হচ্ছে এই টোপ বিএনপি গিলছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিএনপি কৌশলে ভারতীয় নীতিকেই সমর্থন দিচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশের বন্ধু দেশ, সাহায্যকারী দেশ তুরস্ককেও ভালো চোখে দেখছে না বিএনপি। এটা এই কারণে যে, ভারত তুরস্ককে শত্রু দেশ বলে মনে করে। ভারত তুরস্কের বিরোধী হওয়ার একটা বড় কারণ হলো, তুরস্ক বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করছে এবং বাংলাদেশে সমরাস্ত্র উৎপাদনে বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে। বাংলাদেশের জন্য তুরস্কের এই সামরিক সাহায্যকে ভারত ভালো চোখে দেখছে না। বাংলাদেশকে আজ্ঞাধীন রাখার জন্য ভারত চায় সেনা সংখ্যা ও সমরাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ দুর্বল থাকুক। একইভাবে ভারত অর্থনৈতিক দিক দিয়েও বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভরশীল রাখতে চায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভারত তাদের নীতি ও আদর্শকে বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এইভাবে ভারত ভেতর থেকে বাংলাদেশকে দখলে নিতে চাচ্ছে। আওয়ামী লীগ শাসনের গত ১৫ বছরে এরই নগ্ন রূপ দেখা গেছে। এই কারণে বাংলাদেশের কোন দেশপ্রেমিক মানুষই আজ ভারতকে বন্ধু ভাবতে পারছে না বন্ধু ভাবেও না। সুতরাং বিএনপি ভারতপন্থী বা ভারতের প্রতি দুর্বল হওয়ার অভিযোগ উঠলে দেশপ্রেমিক ভোটারদের সমর্থন সে হারাবে।

নির্বাচনে জামায়াত পক্ষের পরিচয়গত সুবিধা

(ক) দেশের জনগণের কাছে জামায়াতের লোকেরা দখলদারি, চাঁদাবাজিসহ সকল দুর্নীতি থেকে মুক্ত সৎ লোক হিসাবে পরিচিত। সামাজিক উঠাবসা, কায়কারবার সহ সামাজিক নানা প্রতিষ্ঠানে জামায়াতের লোকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন দেখে

মানুষের মনে এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াত এককভাবে এখনো সরকার গঠন করতে পারেনি। জোটের অংশ হিসেবে একবার সরকারে গিয়ে দুইজন মন্ত্রী মাত্র ভাগে পেয়েছিল। তারা কৃষি, শিল্প ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তাদের মন্ত্রিত্বের পূর্ণ মেয়াদকালীন সময়ে তারা যে দায়িত্ব পালন ও কর্ম সম্পাদন করেন তা মানুষের এই বিশ্বাসকে বাস্তব রূপ দিয়েছে যে, এক পয়সার দুর্নীতি না করেও জামায়াতের লোকেরা মন্ত্রিত্ব চালাতে পারে। শুধু দুর্নীতি না করা নয়, দুর্নীতি ও সরকারি অর্থের অপচয় আত্মসাৎ বন্ধে যতটা সাধ্য ও সুযোগ তাদের ছিল তারা তা ব্যবহার করেছেন। মন্ত্রীত্বের মেয়াদকালে তাদের স্বজন প্রীতি ও বেআইনি সুবিধা আদায়ের কোন দৃষ্টান্ত কেউ পায়নি। ওয়ান ইলেভেনের সরকার এবং পরবর্তীকালে শেখ হাসিনার ১৬ বছরের সরকার আঁতি-পাঁতি করে খুজেও দুই মন্ত্রীর কোন দুর্নীতি বের করতে পারেনি। দেশের ভোটাররা জামায়াতের লোকদের সততাকেই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। দুই মন্ত্রীর দুর্নীতিহীন কার্যকলাপ দেখার পর এখন জামায়াতকে ক্ষমতায় দেখা তাদের প্রত্যাশা। তাদের স্লোগান এইরকম- 'আওয়ামী লীগ-বিএনপিকে দেখা শেষ এবার জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ'। এবারের নির্বাচনে জনগণের এই আস্থা আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বাসই জামায়াতে ইসলামীর সবচেয়ে বড় সুবিধার দিক।

(খ) জামায়াতে ইসলামীর গণতন্ত্র-মনস্কতা জামায়াতের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে একটা বড় বিষয়। জামায়াত নিজ দলে যেমন নিখুঁতভাবে গণতন্ত্র চর্চা করে, তেমনি দেশের জন্যেও নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র চায়। শত নির্যাতন, নিপীড়নের মধ্যেও জামায়াতে ইসলামী গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অটল, অনড় থেকেছে। পাকিস্তান আমলের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী ছিল। তখন শেখ মজিব, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নেতাদের দল ও অন্যান্য দলের সাথে জামায়াতে ইসলামী জোটবদ্ধ ও যুগপদ আন্দোলন করেছে। মধ্য ষাটের দশকে শেখ মুজিব যখন জেলে, তখন পূর্ব পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (পিডিএম) এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আযম (সভাপতি ছিলেন আওয়ামী লীগের অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম)। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন আইয়ুব খানের পতন পর্যন্ত চলে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কারণেই পাকিস্তানে ষাটের দশকের শুরুতে জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় (যেমন জুলাইয়ের বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে শেখ হাসিনা জামায়াতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল)। বাংলাদেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। কখনও জোটবদ্ধভাবে, কখনও যুগপদ।

লক্ষণীয় যে, অধিকাংশ বড় দল গণতন্ত্রের কথা বলে, আন্দোলনও করে। কিন্তু এদের দলে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। সেখানে নিরেট স্বৈরতন্ত্র। এরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। ক্ষমতায় গিয়ে এরা নিজ দলে যেমন, তেমনি দেশেও স্বৈরতন্ত্র কায়েম করে। এটাই বাংলাদেশে চলে আসছে এবং এ কারণেই দেশ ও জাতির স্বার্থ এদের হাতে ভুলণ্ঠিত হয়েছে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বও এরা বিকিয়ে দিয়েছে বৃহৎ প্রতিবেশী বা অন্য কারো কাছে। জনগণ এদের হাত থেকে বাঁচতে চায়। জনগণের দৃষ্টি এখন জামায়াতে ইসলামীর দিকে। গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি জামায়াতে ইসলামীর নিষ্ঠা দেশের ভোটারদের আকৃষ্ট করছে।

(গ) জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং দলের সবার এবং সর্বস্তরে আইন মেনে চলার যে দৃশ্য মানুষ জামায়াতের মধ্যে দেখে তা মানুষকে জামায়াতে ইসলামীর দিকে আকৃষ্ট করছে। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই মনে করে, একটি সরকারে যদি এ ধরনের শৃঙ্খলা এবং এইভাবে সরকারের সকলে আইন মেনে চলে তাহলে দেশের আমলা (প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা কর্মচারী) এবং নাগরিকদের সবার মধ্যে ধীরে ধীরে সততা, শৃঙ্খলা এবং আইন মেনে চলার অভ্যেস সৃষ্টি হবে। দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতির ছয়লাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সকলের বিশেষ করে রাজনীতিকদের সততা, শৃঙ্খলা এবং আইনের প্রতি মান্যতার প্রয়োজন খুব বেশি। এই কারণেই সবার দৃষ্টি জামায়াতের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তারা মনে করছে, জামায়াত ও তার সমমনা দল যদি সরকারে যেতে পারে, তাহলে দেশের বাঞ্ছিত ইতিবাচক পরিবর্তনের যাত্রা শুরু হতে পারে। জামায়াত ও তার সমমনাদের ব্যাপারে জনগণের এই চিন্তা নির্বাচনে জামায়াতের জন্য একটা বড় সুবিধার বিষয় হবে।

(ঘ) দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সচেতন ভোটাররা জামায়াতের যে বিষয়টাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে সেটা হলো, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংহতি রক্ষার ব্যাপারে জামায়াতের অনড় আদর্শিক অবস্থান। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জাতি গোষ্ঠীর সকলেরই সমান অধিকার। জাতি-গোষ্ঠী বা ধর্ম-গোষ্ঠীগত নীতি নিয়ম মানার ক্ষেত্রে সকলে স্বাধীন। তবে যে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি, তা মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধ এবং মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন দাবির ফল। পূর্ববংগের অবহেলিত, নির্যাতিত কৃষক মুসলমানরা যদি এই দাবি না তুলতো তাহলে পূর্ববঙ্গ হতো মোদির ভারত রাষ্ট্রের একটা অংশ, যেমন কাশ্মীর। তাহলে আমরা এই বাংলাদেশ পেতাম না, বাংলাদেশের রাষ্ট্রও হতোনা। '৪৭-এর ভারত বিভাগের পর আমরা পেয়েছিলাম পূর্ব পাকিস্তান। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের মানুষ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করেছে। অতএব বাংলাদেশ ভূখণ্ড '৪৭-এর ভারত বিভাগের সৃষ্টি। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ

রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণাপত্রে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অস্বীকার করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের কারণ হিসেবে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও সংসদ ডেকে তাদের সংবিধান প্রণয়ন করতে না দেয়া এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে বাংলাদেশীদের উপর নৃশংস যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়াকে দায়ী করা হয়েছে। এবং এই পরিস্থিতিতেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হবে "১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল....।" স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ভূ-খণ্ডের এই সংজ্ঞায়নই বলছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ভূ-খণ্ড হল '৪৭-এর ভারত বিভাগের উত্তরাধিকার। আর '৪৭-এর ভারত বিভাগের ভিত্তি হল মুসলমানদের স্বাতন্ত্র চেতনা। আর মুসলমানদের স্বাতন্ত্র চেতনার ভিত্তি ইসলাম। এই মুসলিম স্বাতন্ত্র চিন্তা বা ইসলামকে যদি বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতির চিন্তা থেকে মাইনাস করা হয়, তাহলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলভিত্তির যেমন বিলয় ঘটবে, তেমনি বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চিন্তাও তখন দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রতিবেশী একটি বড় দেশ এই মাহেন্দ্র ক্ষণেরই অপেক্ষা করছে। তাদের এই অপেক্ষারকাল সংক্ষিপ্ত করার পথে জামায়াতে ইসলামী বড় একটা বাধা। এজন্যেই দেশের ভোটাররা জামায়াতে ইসলামীকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও সংহতির একটা বড় পাহারাদার মনে করে। এবার নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর আদর্শবাদীতা ও ভারতীয় ষড়যন্ত্রের বিরোধিতার নীতি জামায়াতে ইসলামীর জন্য বড় ইতিবাচক বিষয় হিসেবে কাজ করবে।

আসন্ন নির্বাচনে জামায়াত পক্ষের অসুবিধা

(ক) জামায়াতে ইসলামী একটা নিষ্ঠাবান ইসলামী দল। তারা শরীয়তের সংবিধানের বাস্তবায়ন চায়। এটা ভয়ের বস্তু হিসেবে প্রচার করা হয়ে থাকে। এই প্রচার নির্বাচনে জামায়াতের অসুবিধা করতে পারে। কিন্তু জামায়াত মনে করে ইসলামী আইন সম্পর্কে এই ভয় ও প্রচারণা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। ইসলামের আইন সব মানুষের কল্যাণের জন্য, তাদের ক্ষতির জন্য নয়। ইসলাম সম্মত বা ইসলাম নির্দেশিত সার্বিক বিবেচনা ছাড়া অন্ধভাবে ইসলামী আইনের প্রয়োগ হয় না। একবার দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) চোরের হাত কাটার শাস্তি স্থগিত করেছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ইসলামের এই নীতির কথা তুলে ধরে যে, চোরকে শাস্তি দেওয়ার আগে চুরি না করতে হয় এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

ব্যভিচারের শাস্তি বিবাহিত এবং অবিবাহিতদের জন্য এক রকমের নয়। অবিবাহিতদের যেটুকু ছাড় দেয়া হয়েছে বিবাহিতদের তা দেয়া হয়নি। আর ব্যভিচারকে যা উৎসাহিত করে, উদ্বুদ্ধ করে, অবারিত করে এবং যে পরিবেশ

ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে, সেসব দূর না করা পর্যন্ত ব্যভিচারের শাস্তি বিষয়ে ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হযরত ওমর (রা) এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারেন। মেয়েদের পোশাক বা পর্দার ক্ষেত্রেও এ একই কথা। ইসলামের নির্দিষ্ট কোন ড্রেস কোড বা পোশাক নীতি নেই। রয়েছে শুধু দেহের প্রকাশযোগ্য অংশকে ঢেকে রাখার বিধান। মেয়েদেরকে তাদের দেহের 'সুন্দর' ও 'আকর্ষণীয়' অংশকে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। এখানে ঢেকে রাখার 'স্থান'-এর নাম না বলে বিষয়টা মানুষের চিন্তা, প্রয়োজন ও বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অনেকেই মুখকে আল কোরআন নির্দেশিত 'সৌন্দর্যের স্থান' মনে করে না। বিবেচনা-বিতর্কের সুযোগ আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, ইসলামের শরীয়তের শাস্তি আইন মানুষের জন্য ভয়ের নয় ভালোর জন্য। সুতরাং ইসলামের শরীয়ত বিষয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার নির্বাচনে জামায়াতের ক্ষতি তেমন করার কথা নয়।

(খ) নিষ্ঠাবান ইসলামী দল জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে নিকট প্রতিবেশী বড় দেশ ভারত এই সরকারকে গ্রহণ করবে না এবং জামায়াতে ইসলামী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবস্থার সৃষ্টি করে দেশের ক্ষতি করবে, এমন ধারণা এবং এমন প্রচারণা অনেকেই করেন। জামায়াত এ বিষয়টাকে খুব গুরুত্ব দেয় না। জামায়াত জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হলে ভারত কোন পলিসি গ্রহণ করবে সেটা ভারতের ব্যাপার। তবে জামায়াত বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং শত্রুর সাথেও সু ব্যবহার ও সুবিচারমূলক আচরণ করবে। সমতা ও সমঅধিকারের ভিত্তিতে সবার সাথেই জামায়াত সুসম্পর্ক চাইবে, প্রতিবেশী ভারতের সাথে তো বটেই। দেশের নিরাপত্তা এবং দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষাই হবে জামায়াতের বিদেশনীতি এবং বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। জামায়াতের কাছে দেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিষয়টি সবার উপরে, তারপরে আসবে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিবেচনা। সব দেশই তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে এটাই চায়, অতএব বাংলাদেশের এটা চাওয়া দোষের নয়। সুতরাং সব দেশই যদি একে অপরের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বকে মান্য করে, সম্মান করে ও দাদাগিরি না করে এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কেউ কারো প্রতি অবিচার না করে তাহলে সবার সাথে সবার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। ভারতও গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে এই নীতির সাথে দ্বিমত পোষণ করার কথা নয় এবং দ্বিমত পোষণ করে না। জামায়াত এই বিশ্বাসই পোষণ করে। সুতরাং জামায়াত নির্বাচনে জিতলে বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ করে ভারতের সাথে সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ বোধ করার তেমন কিছু দেখেনা জামায়াত। আর এ কথাই সত্য যে, যে নিজের পায়ের উপর শক্তভাবে দাঁড়াতে পারে তাকে শত্রু, মিত্র নির্বিশেষে সব দেশই সমীহ করে, সম্মান করে। আদর্শিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিক জামায়াতে ইসলামীর নিজের পায়ে শক্তভাবে দাঁড়াবার মত শক্ত মেরুদন্ড রয়েছে।

নির্বাচনে জিতছে কে হারছে কে?

আসন্ন নির্বাচনে প্রধান প্রতিপক্ষ দুই দল বা পক্ষের নির্বাচনে লড়ার সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক দিকগুলো পর্যালোচনার পর এখন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে আসন্ন নির্বাচনে কে তাহলে জিতছে? এর উত্তর কারো জানা নেই। একমাত্র আল্লাহ তা জানেন। তবে পারিপার্শ্বিকতা ও বিভিন্ন কার্যকারণ বিবেচনা করে অনেকেই নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে অনুমান করতে পারেন। আমিও এমন একটা অনুমান প্রকাশ করতে পারি।

নির্বাচনে মূলত প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল। জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি। এই দুই দলের যে দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার সমর্থন করবে তারাই ক্ষমতায় যাবে। এই সমর্থন দানের ক্ষেত্রে এবারের নির্বাচনে ভোটারদের প্রধান চাওয়ার বিষয় হবে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পেশিশক্তির যথেচ্ছাচার, দখলদারি, চাঁদাবাজি, ক্ষমতার আসনকে নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্যে ব্যবহার করার মত চরিত্রহীন কাজগুলিই জনগণের অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট এবং দেশের অগ্রগতি পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। ভোটাররা চায় এই কারণের মূল উৎপাটন। জনগণের এই চাওয়া বিএনপি'র সাথে মিলে না। যারা রাজনীতি করে নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য দেশ ও জনগণের স্বার্থ রসাতলে দিয়ে হলেও বিএনপি'র অধিকাংশের চরিত্র তাদেরই মত। জিয়াউর রহমানের সময়টা বাদ দিলে বিএনপি এ পর্যন্ত দুইবার ক্ষমতায় গেছে। বিএনপি'র নেতা ও কর্মীদের শাসক চরিত্র তখন আওয়ামী লীগের মতোই ছিল। তবে মানুষ বিএনপি'কে আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে নিয়েই ভোট দিয়েছে মন্দের ভালো হিসাবে। কিন্তু এখন আওয়ামী লীগ ভোটের মাঠে না থাকায় মানুষ মন্দের ভালো দল বিএনপি'র বিকল্প হিসেবে দুর্নীতিমুক্ত, চাঁদাবাজিমুক্ত, ক্ষমতার আসনকে নিজ স্বার্থে ব্যবহারের ইচ্ছামুক্ত একটা রাজনৈতিক বিকল্পের সন্ধান করছে, বিশেষ করে 'জুলাই বিপ্লব ২৪'-এর পর মানুষের এই চাওয়া তীব্র হয়েছে। এখানে এসেই সন্ধানী মানুষের দৃষ্টি জামায়াতে ইসলামীর উপর পড়ছে। জামায়াতে ইসলামীর লোকদেরকে সৎ, দখলদারি ও চাঁদাবাজিমুক্ত, দুর্নীতি ও আত্মসাৎবিরোধী হিসেবে দেখেছে মানুষ। এবারের নির্বাচনে মানুষ এই গুণগুলোকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সুতরাং নির্বাচন ঠিকমতো হলে ক্ষমতার আসনের জন্য জামায়াতে ইসলামী ভোটারদের বাছাইকৃত দল হতে পারে। এমন আশা ইতিমধ্যেই জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ভবিষ্যৎ জানেন একমাত্র আল্লাহই, ভবিষ্যতের নির্মাণও তাঁরই হাতে। বান্দাদের সক্রিয় ও আন্তরিক ইচ্ছাকে, চাওয়াকে তিনি মূল্য দেন, দয়ার দানও তখন বান্দাদের জন্য আসে। চাওয়া-পাওয়ার এই মিলনের নামই বিজয়। ■

২৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

ইসলাম গণতন্ত্র ও নির্বাচন

ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভোটের মাধ্যমে কাউকে নির্বাচিত করতে হলে যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকে নির্বাচিত করতে হবে

ভোট একটি পবিত্র আমানত। এর মাধ্যমে জন প্রতিনিধি বা নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। এজন্য কোন পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন উপযুক্ত, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোক নিয়োগ করা আবশ্যক, অনুরূপভাবে ভোটের মাধ্যমে কাউকে নির্বাচিত করার ক্ষেত্রেও অবশ্যই যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ লোককে নির্বাচিত করতে হবে। অন্যথায় তাকে আমানতের খেয়ানতকারী হিসেবে সে সকল পরিণতিই ভোগ করতে হবে, কোন অযোগ্য লোককে কোন পদে নিয়োগ দিলে তার যে পরিণতির বর্ণনা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভোট অর্থ স্বাধীনভাবে মতামত প্রদান, বাছাই করা, পছন্দ করা, নির্বাচিত করা ইত্যাদি। নেতৃত্ব বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট পন্থায় কারো পক্ষে মত প্রদান করা। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মতামত দেওয়া।

ভোট প্রদানের গুরুত্ব : ভোট একটি পবিত্র আমানত। উপযুক্ত পাত্রে ভোট প্রদান করলে সে আমানতের হক আদায় হয়। আর অযোগ্য পাত্রে তা প্রদান করলে সে আমানতের খেয়ানত করা হয়। আর ভোট প্রদানে বিরত থাকার কারণে যদি অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তি অথবা তুলনামূলকভাবে অধিক অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হয়, তাহলে এর দায় তার কাঁধেও বর্তাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমানতকে তার প্রকৃত ও উপযুক্ত 'হকদারকে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।[১]

দ্বিতীয়ত : ভোটের মাধ্যমে যাদের নির্বাচিত করা হয়, মূলত: তারাই সমাজ পরিচালনা করে। তারা মানুষের প্রতি ইনসাফ বা জুলুম উভয়ই করতে পারে। খারাপ লোক নির্বাচিত হলে সমাজে অন্যায় ও জুলুম জেঁকে বসে। অপর দিকে ভাল ও ন্যায়পরায়ণ লোক নির্বাচিত হলে সমাজে ভাল ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ভোটের মাধ্যমে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ লোক নির্বাচিত করা আবশ্যক। দুনিয়ার কোন স্বার্থে সৎ লোক ও ন্যায়পরায়ণ লোকের পরিবর্তে অসৎ, আযোগ্য ও অন্যায়প্রবণ লোককে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে গুনাহগার হতে হবে।

ইত:পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দিলে সে অভিশাপযোগ্য, তাঁর 'ইবাদাত কবুল হবে না এবং সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। অনুরূপভাবে যোগ্য ও সৎ লোক বর্তমান থাকতে অযোগ্য ও অসৎ লোককে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলেও একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

---

১. ৪, সূরা আনআম : ৫৮

তৃতীয়ত : ভোটের মাধ্যমে যাদেরকে নির্বাচিত করা হয়, তারা সমাজের নেতৃত্ব দেয়। অর্থাৎ তারা হন নেতা এবং জনগণকে তাদের আনুগত্য করতে হয়। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, **الناس على دين ملوكهم** "জনগণ তাদের শাসকদের দ্বীন (বিধি বিধান) এর আলোকে পরিচালিত হয়।" শাসকগণ ভাল হলে তারা জনগণকে ভাল পথে পরিচালিত করে। ফলে জনগণের জন্য দ্বীন ও কল্যাণের পথে চলা সহজ হয় এবং তারা দ্বীন মানার মাধ্যমে জান্নাতের পথে পরিচালিত হয়। আর শাসকগণ মন্দ হলে তারা জনগণকেও মন্দ ও গোমরাহীর পথে পরিচালিত করে। ফলে দুনিয়ায় মন্দ ব্যাপকতা লাভ করে সামাজিক অশান্তি তৈরি করে এবং দ্বীনের পথ অমান্য করায় জাহান্নামের পথে পরিচালিত হয়। স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় জনসাধারণ তাদের পথে পরিচালিত হয়, যারা সমাজ পরিচালনা করে। সুতরাং শাসক বা পরিচালক ভাল হওয়া সমাজ ভাল হওয়ার পূর্বশর্ত।

চতুর্থত : ইসলাম অযোগ্য, অসৎ ও অন্যায়কারী লোকদের হাতে নেতৃত্ব দিতে ও তাদের আনুগত্য করতে নিষেধ করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

(হে নবী) ধৈর্যধারণ করে তুমি নিজেকে তাদের সাথে রাখো, যারা সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। আর পার্থিব জগতের সৌন্দর্যের ইচ্ছায় তাদের থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা। যার অন্তর আমার স্মরণ থেকে গাফেল ও যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা লংঘনমূলক তার অনুসরণ করো না।'[২]

এ প্রসঙ্গে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي، رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ، لِمَنْ عَصَى اللَّهَ»

"'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সা.) বলেছেন, শীঘ্রই আমার পরে তোমাদের শাসক এমন ব্যক্তিরা হবে, যারা সুন্নাহকে নির্বাপিত করে বিদ্'আতের উপর 'আমল করবে', সালাত তার সময় থেকে পিছিয়ে দিয়ে আদায় করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) আমি যদি তাদেরকে পাই তাহলে কী করব? তিনি বললেন, হে ক্রীতদাসের মায়ের পুত্র, কী করবে আমাকে সে প্রশ্ন করছো? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় তার জন্য কোনো আনুগত্য নেই।"[৩]

عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ

---

২. ১৮, সূরা আল কাহাফ : ২৮।

৩. ইবন মাজাহ, কিতাবুল জিহাদ, বাবু লা তা'আতা ফি মা'সিয়াতিল্লাহ, হাদীছ নং ২৮৬৫।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»

"'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন এবং এক ব্যক্তিকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। সে অগ্নি প্রজ্জলিত করে বলল, এতে প্রবেশ কর। তখন কিছু লোক তাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল আর অন্যরা বলল, আমরা এ থেকে পালিয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট এটি বর্ণনা করলে, যারা তাতে প্রবেশের ইচ্ছা করেছিল তাদেরকে তিনি বললেন, যদি তোমরা তাতে প্রবেশ করতে, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তাতেই অবস্থান করতে। অন্যদেরকে তিনি উত্তম কথা বলে বললেন, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য শুধু ভাল কাজে।"[৪]

পঞ্চমত : অসৎ লোকেরা নির্বাচিত হলে দুর্নীতি ও লুটপাট করে দেশের চরম ক্ষতি করে। এতে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়, দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধিকার বঞ্চিত হয় এবং সর্বসাধারণ তাদের সেবা পাওয়ার পরিবর্তে হয়রানির শিকার হয়।

সুতরাং ভোট এমন লোকদেরকে দিতে হবে, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য অন্যায় বাড়াবাড়ি করে না। অধিকন্তু তারা অধিনস্ত লোকদেরকে সৎ পথে পরিচালনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। ফলে জনগণ দুনিয়ায় শান্তি লাভ করে এবং তাদের দিক নির্দেশনায় দ্বীনের পথে পরিচালিত হয়ে আখিরাতে জান্নাত লাভের উপযোগী হয়।

জনগণের ভোটের জন্য যারা মনোনীত হন, তাদের মধ্যে ভাল ও যোগ্য এবং মন্দ ও অযোগ্য উভয়ই থাকলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভাল ও যোগ্য লোককে ভোট দিতে হবে। তারা যদি সকলেই ভাল ও যোগ্য হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ভাল ও যোগ্য তাকে ভোট দিতে হবে। অপর দিকে তারা সকলেই যদি মন্দ ও অযোগ্য হয়, তাহলে অপেক্ষাকৃত কম মন্দ ও কম অযোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দিতে হবে।

তবে যদি তাদের সকলেই সমান ভাল বা সকলেই সমান মন্দ হয়, তাহলে তাদের মধ্য হতে যাকে খুশি ভোট দেওয়া যাবে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ ইমামগণের কতিপয় মূলনীতি নিম্নে পেশ করা হল :

১. 'আল্লামা ইবন দাকীক আল 'ঈদ বলেন,

دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.

"দু'টি বিপর্যকারী বস্তুর মধ্যে বড়টিকে প্রতিহত করার জন্য ছোটটিকে গ্রহণ করতে হবে। এবং দু'টি কল্যাণকর বিষয়ের মধ্যে কম কল্যাণকর বিষয়টি বর্জন করে অধিকতর কল্যাণকর বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে।"[৫]

২. আল্লামা নদবী বলেন,

إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة و أقلهما ضررا لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح

৪. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাবু ওজুবি তা'আতিল উমারা ফি গায়রি মা'সিয়াতিন, হাদীছ নং ১৮৪০।
৫. ইমাম ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, (দারুল হাদীছ, কায়রো, ২০০৪ খ্রী.) খ. ১, পৃ. ৩৮৭।

'যদি অপারগ ব্যক্তির নিকট দু'টি হারাম একত্রিত হয়, তাহলে তার কোনটিই বিনা প্রয়োজনে বৈধ হবে না। একান্ত প্রয়োজনে গ্রহণ করতে হলে উভয়টির মধ্যে যেটি কম অনিষ্টকারী ও কম ক্ষতিকর তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা এর অতিরিক্ত তার জন্য প্রয়োজন নয় বিধায় তা বৈধ নয়।"

৩. ইমাম যায়লা'ঈ বলেন,

الاصل قى جنس هذه المسائل : أن من ابتلى ببليتين و هما متساويان يأخذ بأيهما شاء وان اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة

"এ ধরনের বিষয়ে মূলনীতি হলো : যে ব্যক্তি দু'টি ক্ষতিকর বস্তুর সম্মুখীন হয়, সে বস্তু দু'টি সমান ক্ষতিকর হলে তন্মধ্যে যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করবে। যদি ক্ষতিকর হওয়ার দিক দিয়ে কম বেশি হয় তাহলে দু'টির মধ্যে যেটি কম ক্ষতিকর সেটি গ্রহণ করবে। কেননা একান্ত প্রয়োজন ছাড়া হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া জায়েয নয়।"[৬]

৪. ইমাম গাজ্জালী বলেন, **و أرتكاب أهون الضررين يصير واجبا بالاضافة الى أعظمهما**

"দু'টি ক্ষতিকর বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিষয় গ্রহণ করা ওয়াজিব।"[৭]

৫. ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেন,

أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد و تقليلها و أنها ترجح خير الخيرين و شر الشرين و تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما و تدفع أعظم المفسدتين بإحتمال أدناهما

"বস্তুত: শরী'আত এসেছে মানুষের কল্যাণ লাভ ও সেটির পূর্ণতা দান এবং বিপর্যয় দূর করা ও তা হ্রাস করার জন্য। তাই দু'টি ভালর মধ্যে অধিক ভালটিকে এবং দু'টি মন্দের মধ্যে অধিক মন্দটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সুতরাং দু'টি ভালর মধ্য হতে ছোটটিকে বাদ দিয়ে বড়টিকে গ্রহণ করতে হবে এবং দু'টি খারাপের মধ্যে ছোটটিকে গ্রহণ করে বড়টিকে তিরোহিত করতে হবে।"[৮]

উপরোক্ত মূলনীতিগুলোর আলোকে সর্বক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ইসলামের বিধি বিধান ও নীতিমালা মেনে চলা সকল মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। ভোটের মাধ্যমে নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধি নির্বাচন যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, সেহেতু ইসলামের মূলনীতির আলোকেই তা প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ভোট অবশ্যই সৎ, যোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে প্রদান করতে হবে। অন্যথায় আমানতকে তার সত্যিকার প্রাপকের কাছে না পৌঁছানোর দায়ে দোষী এবং গোনাহগার হতে হবে।

ভোটের ব্যাপারে ভুল ধারণা : বহু সংখ্যক লোকের বদ্ধমূল ধারণা যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রচলিত ভোট বা নির্বাচন ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হতে গৃহীত, যা অনৈসলামিক। কিন্তু এ ধারণাটি সঠিক নয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ

---

৬. ইবন নাজীম, আল আশবাহ ওয়ান নাজাইর।

৭. শায়খ শুকরী আল মাজুলী, ইমাম গাজ্জালী, আল মুস্তাশফা (দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি.) খ. ১, পৃ. ৮৯ এর উদ্ধৃতিতে।

৮. ইবন তাইমিয়া, মাজমু'আতুল ফাতাবী, খ. ২০, পৃ. ২৯।

(সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে এ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল। আমরা এখানে নির্বাচন, গণতন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

ইসলাম ও গণতন্ত্র : দুনিয়াতে মানুষ যে প্রতিপত্তি লাভ করেছে তা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহেই লাভ করেছে। আল্লাহর দেওয়া মর্যাদা ও শক্তি সামর্থের ফলেই তাঁর দেওয়া স্বাধীন ক্ষমতাবলে মানুষ তাঁর যমীন ব্যবহার করে। এজন্য দুনিয়ায় মানুষের স্বাধীন মালিকানা নেই। বরং মানুষ প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলার খলিফা বা প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে খলিফা বানাবো। (২, সূরা বাকারা : ৩০)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

তিনি সে সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে যমীনে খলিফা বানিয়েছেন। (৩৫, সূরা ফাতির : ৩৯)

ইসলামের এ রাজনৈতিক মত কোনো ব্যক্তি বিশেষকে কিংবা কোনো পরিবার বা কোনো শ্রেণী বিশেষকে 'প্রতিনিধি' বলে আখ্যা দেয়নি, বরং সে দলই হয় এ খিলাফতের ধারক-বাহক যারা ইসলামের মূলনীতিগুলো সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্র-সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এমন সমাজই সমষ্টিগতভাবে খিলাফতের অধিকারী এবং এ খিলাফত এ ধরনের সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের প্রাপ্য। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল এ খিলাফতের একক ধারক-বাহক নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ (আমলে সালেহ) করে তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে খিলাফত দান করবেন, যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে।' (২৪, সূরা আন নূর : ৫৫)

এ আয়াতের আলোকে ঈমানদারদের জামায়াতের প্রত্যেক ব্যক্তিই খিলাফাতের সমান অংশীদার।

গণতন্ত্র : ইসলামের রাজনীতিতে এখান থেকেই শুরু হয় গণতন্ত্রের পদযাত্রা। ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই খিলাফতের অধিকারী ও স্বাধীনতার মালিক। এ অধিকার ও স্বাধীনতায় সমগ্র মানুষই সমান অংশীদার। এ ব্যাপারে কেউ কারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে তার এ অধিকার ও স্বাধীনতার স্বত্ব থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু সকলকেই সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাষ্ট্রের শাসন শৃঙ্খলা বিধানের জন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে রাষ্ট্রের শাসন শৃঙ্খলা বিধানের জন্য যে সরকার গঠিত হবে তা এ সমাজেরই ব্যক্তিদের মত অনুযায়ী গঠন করতে হবে। এরাই নিজ নিজ খিলাফতের অধিকার হতে এক অংশ সেই সরকারকে দান করবে। রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে তাদের মতের মূল্য অনিবার্যরূপে স্বীকৃত হবে। তাদেরই পরামর্শক্রমে

সরকার চলবে। যে ব্যক্তি তাদের আস্থা লাভ করতে পারবে, সে তাদের সকলের তরফ থেকে খিলাফতের বিরাট দায়িত্ব পালন করবে। আর যে তাদের আস্থা হারাবে, সে অবশ্যই খিলাফতের পদ হতে বিচ্যুত হতে বাধ্য হবে। এ দিক দিয়ে ইসলামী গণতন্ত্র একটি পরিপূর্ণ গণতন্ত্র। একটি গণতন্ত্র যতদূর পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত হতে পারে, এটা ঠিক ততখানিই পরিপূর্ণ ও নিখুঁত।

এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কর্মনীতি

এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কর্মনীতি ছিল গণতান্ত্রিক। তিনি এ সকল ক্ষেত্রে শুরা বা পরামর্শের আলোকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

দ্বিতীয় 'আকাবার শপথে মদিনার আওস ও খাজরায গোত্রের ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী অংশ গ্রহণ করেছিল। বায়'আত শেষে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে ১২ জন নেতা নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবন হিশাম বলেন,

و قد كان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أخرجوا إلى منكم إثنى عشر نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم . فأخرجوا منهم إثنى عشر نقيبا تسعة من الخزرج و ثلاثة من الأوس

"আর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে ১২ জনকে নির্বাচিত করে আমার নিকট নিয়ে আস, যাতে তারা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তখন তারা তাদের মধ্য হতে ১২ জনকে নির্বাচিত করল। যাদের ৯ জন ছিল খাজরাজ গোত্রের এবং ৩ জন ছিল আউস গোত্রের।"[৯]

তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে বললেন, আপনারা এ দ্বাদশজন, মরিয়ম তনয় 'ঈসার শিষ্যগণের ন্যায় আপনাদের দেশে আমার প্রতিনিধি রূপে আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে থাকবেন, এটা আপনাদের বিশেষ কর্তব্য। এজন্য আপনারা প্রস্তুত আছেন কি? গভীর ভক্তি বিজড়িত দ্বাদশ কণ্ঠ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল– হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত।[১০]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাসূল নিজে ১২ জন নেতা বেছে নেননি, বরং তাদেরকেই তাদের নেতা বাছাইয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা যাদেরকে বাছাই ও নির্বাচিত করে দিয়েছেন, তাদেরকেই তিনি প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়েছেন।

ওহুদ যুদ্ধে তিনি সাহাবীগণেরর মরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁর মত ছিল মদিনায় অবস্থান করে যুদ্ধ করা। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী মদিনার বাইরে ওহুদে গিয়ে যুদ্ধের মত দেওয়ায় তিনি তাঁর মত ত্যাগ করে অধিকাংশের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মৃত্যুকালে রাসুলুল্লাহ (সা) কোন খলিফা নিয়োগ করে যাননি। বরং খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি তিনি জনগণের হাতে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছেন। নাবী (সা) এর মৃত্যুর পর খলিফা নির্বাচনের জন্য সর্ব সাধারণের বায়'আত বা মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। লোকেরা মসজিদে খলিফার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছেন।

---

৯. তাহযীবু সীরাতি ইবনি হিশাম, দারুল হাদীছ আল আলামিয়্যাহ, (কুয়েত, ১০ম সংস্করণ ১৯৮৪), পৃ. ১০৬।

১০. মাওলানা আকরাম খাঁ, মোস্তফা চরিত, (৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৫) পৃ. ৪৬৪।

খোলাফায়ে রাশেদার নীতি

ইসলামের শাসন ব্যবস্থার যেসব মূলনীতি নাবী (সা) প্রবর্তন করেছেন, নবী (সা) এর পরে সেসব মূলনীতির উপরই খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী (সা) এর প্রত্যক্ষ শিক্ষা-দীক্ষা ও কার্যকর নেতৃত্বের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রত্যেক সদস্যই জানতো, ইসলামের বিধি বিধান ও প্রাণসত্তা অনুযায়ী কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। নিজের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে নবী (সা) কোন ফায়সালা না দিয়ে গেলেও ইসলাম একটি শূরাভিত্তিক খেলাফত দাবী করে, মুসলিম সমাজের সদস্যরা এ কথা অবগত ছিল। তাই সেখানে কোন বংশানুক্রমিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বল প্রয়োগে কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি, খেলাফত লাভ করার জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা-তদবীর করেনি বা নামমাত্র প্রচেষ্টাও চালায়নি। বরং জনগণ তাদের স্বাধীন মর্যীমতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলীফা নির্বাচিত করে। মুসলিম মিল্লাত এ খেলাফতকে খেলাফতে রাশেদা (সত্যাশ্রয়ী খেলাফত) বলে গ্রহণ করেছে। এ থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পায় যে, মুসলিমদের দৃষ্টিতে এটিই ছিল খেলাফতের সত্যিকার পদ্ধতি।

নির্বাচনী খেলাফত

নবী করীম (সা) ওফাতের পর সাহাবীগণ সাকীফায়ে বানী সা'য়েদায় সমবেত হলেন। তারা নাবী (সা.) এর পর কে খলিফা হবেন, তা নিয়েও বিভিন্ন আলোচনা করছিলেন। আনসারগণ বলছিলেন যে, খলিফা আমাদের মধ্য হতে একজন এবং কুরাইশদের মধ্য হতে একজন হোক। আবু বাকর এবং উমার (রা.) এসময় সমবেত জনতার কাছে আগমন করেন এবং আবু বাকর (রা.) আনসারদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের পর কুরাইশদের মধ্য হতে খলিফা নির্বাচিত করার ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন। উমার (রা) খলিফা নির্বাচনের জন্য আবু বাকর (রা) এর নাম প্রস্তাব করে বললেন, হে আবু বাকর, আপনি হস্ত সম্প্রসারণ করুন, আমি আপনার নিকট বায়'আত করবো। আবু বাকর (রা.) বললেন, উমার, বরং তুমিই এর উপযোগি, এ জন্য আমার চেয়ে তুমিই অধিক শক্তিশালী। এ সময় উভয়ই উভয়ের হাতে বায়'আত করার ইচ্ছা করেন। উমার (রা.) আবু বাকর (রা.) এর হাত উন্মুক্ত করে তার হাতে বায়'আত করলেন। অত:পর মদীনার সকলেই (বস্তুত তখন তারা কার্যত সারা দেশের প্রতিনিধির মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিল) তাঁর হাতে বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) করে।[১১]

খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূল (সা) মৃত্যুবরণ করলে তাঁকে দাফন কাফনের পূর্বে মুসলিমগণ খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। তারপর রাসূল (সা) এর দাফন কাফনের দিকে মনোনিবেশ করেন।

সাকিফা বানী সায়েদায় যারা উপস্থিত ছিলেন, প্রথমে তারা আবু বাকর (রা) এর হাতে বায়'আত করেন। অত:পর মসজিদে নববীতে সাধারণ মুসলিমগণ তাঁর হাতে

১১. তাবারী, তারিখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ. ২, পৃষ্ঠা ১৭২। দারু ইবনুল জাওযী, প্রথম সংস্করণ ২০২০।

বায়'আত গ্রহণ করেন। তারপর আবু বাকর (রা) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মিম্বারে দাঁড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন।

আবু বাকর (রা) তাঁর ওফাতকালে আব্দুর রহমান ইবন আউফ, উছমান ইবন আফফান (রা.) প্রমুখের সাথে পরামর্শক্রমে উমার (রা) এর সম্পর্কে ওসিয়াত লিখান, অতঃপর জনগণকে (মসজিদে নববীতে) সমবেত করে বলেন,

'অমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তার উপর সন্তুষ্ট? আল্লার শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বুদ্ধি-বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিনি। আমার কোন আত্মীয়-স্বজনকে নয়, বরং উমার ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তাঁর নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।' সবাই সমস্বরে বলে উঠে, আমরা তাঁর নির্দেশ শুনবো এবং মানবো।[১২]

উমার (রা) খেলাফতের ফায়সালা করার জন্য তাঁর ওফাতকালে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেন, 'মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করো। খেলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সে জন্য তিনি খেলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম সুস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে দেন। খলিফার জন্য এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) এর নাম প্রস্তাব করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, আমি এমন ব্যক্তিকে কিভাবে খলিফা মনোনীত করতে পারি যে তার স্ত্রীকে তালাক দিতেও জানেনা।[১৩] ছ'ব্যক্তিকে নিয়ে এ নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। উমার (রা) এর মতে এরা ছিলেন কওমের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয়।

কমিটির সদস্য আবদুর রহমান (রা) ইবন আওফকে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলিফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করে। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিল, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই ওসমান (রা)-এর পক্ষে। তাই তাঁকেই খেলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ জনসমাবেশে তার বায়'আত হয়।

মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'উমার (রা) যে দলটিকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা সমবেত হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন। 'আবদুর রহমান (রা) তাঁদেরকে বললেন, আমি তো এমন লোক নই যে, এ ব্যাপারে (নির্বাচিত হওয়ার) আশা করব। কিন্তু আপনারা যদি ইচ্ছে করেন, তবে আপনাদের থেকে একজনকে আমি নির্বাচিত করে দিতে পারি। তাঁরা একমত হয়ে 'আবদুর রহমান (রা) এর উপর দায়িত্ব দিলেন। যখন তাঁরা 'আবদুর রহমান (রা) এর উপর দায়িত্ব দিলেন, তখন সকল লোক 'আবদুর রহমান (রা) এর প্রতি ঝুঁকে পড়ল।

---

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।
১৩. তাবারী, খ. ৪, পৃ. ১৬৮। ।

এমনকি আমি একজনকেও সেই দলের অনুসরণ করতে কিংবা তাঁদের পিছনে যেতে দেখলাম না। লোকেরা 'আবদুর রহমান (রা) এর প্রতিই ঝুঁকে পড়ল এবং কয়েক রাত তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে থাকল। শেষে সেই রাত এল, যে রাতের শেষে আমরা 'উসমান (রা) এর হাতে বায়'আত করলাম। মিসওয়ার (রা) বলেন, রাতের একাংশ অতিবাহিত হবার পর 'আবদুর রহমান (রা) আমার কাছে আসলেন এবং দরজায় খটখট করলেন। ফলে আমি জেগে গেলাম। তিনি বললেন, তোমাকে ঘুমন্ত দেখছি। আল্লাহর কসম! আমি এ তিন রাতের মাঝে বেশি ঘুমাতে পারিনি। যাও, যুবাইর ও সা'দকে ডেকে আন। আমি তাঁদেরকে তার কাছে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁদের দু'জনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর আমাকে আবার ডেকে বললেন, 'আলীকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি তাঁকে ডেকে আনলাম। তিনি তাঁর সঙ্গে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত গোপন পরামর্শ করলেন। তারপর আলী (রা) তাঁর নিকট হতে উঠে গেলেন। তবে তিনি আশায় ছিলেন। আর 'আবদুর রহমান (রা) 'আলী (রা) থেকে কিছু (বিরোধিতার) আশঙ্কা করছিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'উছমানকে আমার কাছে ডেকে আন। তিনি তাঁর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করলেন। ফজরের সময় মুয়াযযিন (এর আযান) তাদের দু'জনকে পৃথক করল। লোকেরা যখন ফজরের সালাত পড়ল এবং সেই দলটি মিম্বারের নিকট জমায়েত হলো তখন তিনি মুহাজির ও আনসারদের যারা হাজির ছিলেন, তাঁদেরকে ডেকে আনতে পাঠালেন এবং সেনা প্রধানদেরকেও ডেকে আনতে পাঠালেন এবং এরা সবাই উমার (রা) এর সঙ্গে গত হাজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যখন সকলে এসে জমায়েত হন, তখন 'আবদুর রহমান (রা) ভাষণ আরম্ভ করলেন। তারপর বললেন, হে 'আলী! আমি জনমত যাচাই করেছি, তারা 'উছমানের সমকক্ষ কাউকে মনে করেন না। কাজেই তুমি অবশ্যই অন্য পথ ধরো না। তখন তিনি ['উসমান (রা) কে সম্বোধন করে] বললেন, আমি আল্লাহর, তাঁর রাসূলের ও তাঁর পরবর্তী উভয় খালীফার আদেশ অনুযায়ী আপনার নিকট বায়'আত করছি। অত:পর 'আবদুর রহমান (রা) তাঁর কাছে বায়'আত করলেন। অত:পর মুহাজির, আনসার, সেনাপতিগণ এবং সাধারণ মুসলিমগণ তাঁর কাছে বায়'আত করলেন।[১৪]

এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে,

'উছমান (রা) কে খলিফা নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় 'আব্দুল রহমান ইবন 'আউফ (রা) তিন দিন সাধারণ লোকদের সাথে পরামর্শ করেন এবং 'উছমান (রা) এর পক্ষে জনগণের রায় থাকায় তিনি তাকে খলিফা ঘোষণা করে তার হাতে বায়'আত করেন। এরপর সকলেই 'উছমান (রা) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে 'উমার (রা) যে কথা বলেছেন, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'স্বল্পসংখ্যক লোক অধিকসংখ্যক লোকের অনুসরণ করবে। যে ব্যক্তিকে আমীর নির্বাচিত না করা সত্বেও নিজেই আমীর হয় তাকে হত্যা করো।'[১৫]

---

১৪. বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবু বিতানাতিল ইমাম ওয়া আহলি মাশুরাতিহি, হাদীছ নং ৭২০৭।
১৫. ইবন হাজার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫।

অন্য বর্ণনায় আছে যখন 'উমার (রা) এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, যদি 'উমার (রা) মারা যান, তাহলে আমি অমুক ব্যক্তির নিকট বায়'আত করবো। তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে বললেন, 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের পরামর্শ ব্যতীত কোন ব্যক্তির হাতে বায়'আত করে, তার এবং সে যার হাতে বায়'আত করে তার অনুসরণ করা যাবে না। কেননা তাদের উভয়েরই নিহত হওয়ার আশংকা রয়েছে।'[১৬]

উছমান (রা) এর শাহাদাতের পর নাবী (সা.) এর সাহাবীগণ আলী (রা) এর নিকট এসে বললেন, উছমান (রা.) নিহত হয়েছেন। এখন জনগণের জন্য একজন ইমাম প্রয়োজন। এ সময়ে এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক উপযোগী আমরা আর কাউকে পাচ্ছিনা। আলী (রা.) বললেন, তোমরা এরূপ করোন। কারণ আমি আমীর (খলিফা) হওয়ার চেয়ে উযির (সাহায্যকারী) হওয়া অধিক পছন্দ করি। তারা বললেন, না, আল্লাহ কসম! আমরা আপনার নিকট বায়'আত না করে ছাড়ছি না। তখন তিনি বললেন, তাহলে তা হতে হবে মসজিদে। কেননা আমার বায়'আত গোপনে এবং মুসলিমদের সম্মতি ছাড়া হতে পারে না। এরপর তিনি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন এবং আনসার ও মুহাজিরগণ তার সাথে মসজিদে প্রবেশ করে তার নিকট বায়'আত করলো। তারপর লোকেরাও তার নিকট বায়'আত করলো।[১৭]

তার মৃত্যুকালে জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমীরুল মু'মিনীন। আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেন না কেন? তিনি বললেন, "আমি মুসলিমদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"[১৮]

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খেলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রাসুলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীদের সর্বসম্মত মত এই ছিল যে, খেলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক ব্যবস্থা। মুসলিমদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব তাঁদের মতে খেলাফত নয়, বরং তা বাদশাহী-রাজতন্ত্র। খেলাফত এবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ধারণা সাহাবায়ে কেরামগণ পোষণ করতেন, আবু মুসা আল আশ'আরী (রা) তা ব্যক্ত করেন নিম্নোক্ত ভাষায়,

إِنَّ الْإِمَارَةَ مَا ائْتَمَرَ فِيهَا ، وَإِنَّ الْمُلْكَ مَا غُلِبَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ

এমারাত (অর্থাৎ খেলাফত) হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে, আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।[১৯]

এ আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হয় যে, ধারাবাহিকভাবে চারজন খলিফাই জনসাধারণের বায়'আতের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর ব্যত্যয় ঘটান

---

১৬. বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাবু রাজমিল হুবলা ফিয যিনা ইজা আহসানাত, হাদীছ নং ৬৮৩০ এর শেষাংশ।
১৭. আতাবারী, খ. ৪, পৃ. ৩১৯।
১৮. ইবন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৫, পৃ. ৪৩৪। দারুল ফিকর, বৈরূত, ২০১০ খ্রী.।
১৯. ইবনে সাআদ, আত্তাবকাতুর কাবীর খ. ৪, পৃ. ৯১।দারু ইবনিল জাওযী, কায়রো, প্রথম সংস্করণ,২০১৭ খ্রী.।

মু'আবিয়ারা (রা)। তিনি মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে খলিফা মনোনীত করেন। এটি খলিফা নির্বাচনের সাধারণ ইসলামী নীতির পরিপন্থী ছিল বলেই হোসাইন (রা)সহ বহু সাহাবী সেটিকে মেনে নেননি। জনগণের বায়'আত ব্যতীত খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন যেহেতু ইসলাম সমর্থন করেনা, সে কারণে হোসাইন (রা) এ মনোনয়ন সমর্থন করেননি। বরং তিনি বায়'আত পদ্ধতি অব্যাহত রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। অবশেষে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু খলিফা নির্বাচনের বায়'আতের যে পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে চালু ছিল, তার খেলাফ অন্যায় মনোনয়নকে তিনি মেনে নেননি।

উমার ইবন 'আব্দুল আযীয় (রা), যাকে পঞ্চম খলিফা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তাকে তার পূর্ববর্তী খলিফা সোলায়মান ইবন আব্দুল মালিক উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বারে আরোহণ করেন এবং জনগণ তার নিকট সমবেত হলে একটি ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আমাকে এ বিষয়ে (খলিফা বানিয়ে) পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। এটা করা হয়েছে আমার কোন মতামত গ্রহণ করা বা আমার কোনো আগ্রহ ছাড়াই। আর এ বিষয়ে মুসলিমদেরও কোনো পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। এজন্য আমার খিলাফতের জন্য আপনারা যে বায়'আত করেছেন, তা থেকে আপনাদেরকে মুক্ত করে দিলাম। এখন আপনারা আপনাদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে যাকে খুশী তাকে খলিফা নির্বাচিত করুন। একথা শুনে সমবেত জনতা সমস্বরে বলে উঠল, আমরা আমাদের ও আমাদের শাসনকার্যের জন্য আপনাকেই খলিফা হিসেবে গ্রহণ করলাম। আমরা সকলেই আপনাকে খলিফা হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।[২০] জনগণের রায় পাওয়ার পর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জনগণের খলিফা জনগণের বায়'আত বা রায়ে নির্বাচিত হবে এটিই হলো ইসলামের সাধারণ বিধান। এর বিপরীত কোন কিছু ইসলাম সমর্থন করে না।

মুহাম্মাদ (সা) এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত তদানিন্তন বিশ্বে সাধারণভাবে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র বা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি প্রচলিত ছিল। সে সময় শাসক বা নেতৃত্ব নিযুক্তির ক্ষেত্রে জনমতের কোন স্থান ছিলনা। জনমতের ভিত্তিতে খলিফা বা নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা ইসলামই প্রবর্তন করে। জনগণ যার নিকট বায়'আত করত তিনিই খলিফা নির্বাচিত হতেন।

বায়'আতের মূলকথা হলো, কারো হাতে হাত রেখে তাকে নেতা মেনে তার আনুগত্যের ঘোষণা দেওয়া বা শপথ করা। এটিই বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থপনায় ভোট। অর্থাৎ বায়'আতের মাধ্যমে যেমন কারো পক্ষে মত প্রদান করে তাকে নেতা মেনে আনুগত্যের শপথ করা হয়, ভোটের মাধ্যমেও ঠিক তেমনি কারো পক্ষে মত প্রদান করে তাকে সমর্থন জানানো হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ব্যবস্থাটি ইসলাম প্রবর্তিত হলেও বহু মুসলিম দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আবার অনেক দেশে রাজন্ত্র না থাকলেও জনমতকে পাশ কাটিয়ে অথবা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ছলে বলে কৌশলে

---

২০. ইবন কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৬, পৃ. ৩৫৩।

তাদের মতামতকে নিজের পক্ষে দেখিয়ে অথবা সামরিক কু-এর মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ার বা থাকার চেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অথচ পাশ্চাত্যসহ অধিকাংশ অমুসলিম দেশে জনমতের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার পরিবর্তন হচ্ছে। ইসলামের এ পদ্ধতিটিকে অনেকেই 'পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র' দোহাই দিয় এটিকে অনৈসলামী বলছে। অপরদিকে অস্ত্র বা শক্তির বলে ক্ষমতা দখল করে ইসলাম কায়েমের কথা বলছে, যা একেবারেই বিভ্রান্তিকর এবং যাকে ইসলাম আদৌ সমর্থন করেনা।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম 'নির্বাচন' 'ভোট' ইত্যাদিকে অবৈধ মনে করেনা, বরং এগুলো ইসলামেরই প্রবর্তন। বর্তমানে পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। তা হলো পূর্বে খলিফার জন্য প্রস্তাবিত ব্যক্তির হাতে হাত রেখে বায়'আতের মাধ্যমে তাকে সমর্থন করে তার আনুগত্যের অঙ্গীকার করতে হত, আর বর্তমানে প্রস্তাবিত ব্যক্তির প্রাপ্ত প্রতীকে সীল মেরে তাকে সমর্থন জানানো হয়ে থাকে, যাকে আমরা ভোট প্রদান বলি।

ইসলামী গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্র

ইসলামী গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মধ্যে শুধু একটি জায়গায় মিল খুজে পাওয়া যায়, আর তা হলো, নেতৃত্ব বা সরকার নির্বাচিত হবে জনগণের রায়ে। এ ছাড়া ইসলামী গণতন্ত্র ও পাশ্চাত্য গনতন্ত্রের মধ্যে আকাশ-পাতালের পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্যগুলো হলো :

১. পাশ্চাত্য রাজনীতি জনগণের প্রভুত্বকে বুনিয়াদরূপে স্বীকার করে, কিন্তু ইসলাম জনগণের প্রভুত্বকে স্বীকার করেনা বরং ইসলাম স্বীকার করে জনগণের খিলাফতকে।

২. পাশ্চাত্য রাজনীতিতে জনগণই হচ্ছে বাদশাহ, আর ইসলামের দৃষ্টিতে বাদশাহী একমাত্র আল্লাহর, জনগণ তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

৩. পাশ্চাত্য রাজনীতিতে জনগণ নিজেরাই দেশের শাসনতন্ত্র ও আইন রচনা করে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণকে সেই শরী'আহ বা আইনের অনুসরণ করে চলতে হয়, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

৪. পাশ্চাত্য রাজনীতিতে সরকারের কর্তব্য হচ্ছে রাজ্যের জনগণের ইচ্ছাকে পূর্ণ করা আর ইসলামী সরকার এবং তার প্রতিষ্ঠাতা জনগণ সকলেরই কতর্ব্য হচ্ছে দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করা।

মোটকথা, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হচ্ছে স্বাধীন, নিরঙ্কুশ ও বল্গাহারা প্রভুত্ব, যারা নিজ অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে ভোগ করে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত-ইসলামী গণতন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর দেয়া আইনের অনুসরণ ও অনুশীলন করা। এখানে মানুষ তাঁর অধিকার ও স্বাধীনতাকে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে তাঁরই নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যবহার করবে।

আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি তাহলো ইসলামী গণতন্ত্র, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র নয়। সুতরাং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া বা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম যে গণতন্ত্র প্রবর্তন করেছে, তা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত। সুতরাং সে আলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটদানও সম্পূর্ণ ইসলাম সম্মত। এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো সুযোগ নেই। ■

অপবাদ গালিগালাজ ও চেহারা বিকৃতি : একটি ইসলামী পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

অপবাদ এমন একটি অপরাধ, যা মানুষের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও পারিবারিক পবিত্রতাকে গভীরভাবে আঘাত করে। ইসলাম এ অপবাদকে শুধু মৌখিক অন্যায় হিসেবে নয়, বরং সামাজিক অশান্তির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। একইভাবে গালিগালাজ মানুষের হৃদয়ে ঘৃণা ও বিভেদ সৃষ্টি করে, যা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করে দেয়। চেহারা বিকৃতির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্যে অযথা হস্তক্ষেপ করাকেও শরিয়ত অপছন্দ করেছে। কুরআন-হাদীস এসব আচরণ থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ প্রদান করে। কারণ এগুলো ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা এবং সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষার উপর ভিত্তি করে গঠিত। কাযাফ, গালি এবং বিকৃতি এই তিনটি বিষয়ে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝলে ব্যক্তি ও সমাজ উন্নত। নৈতিকতার পথে এগিয়ে যেতে পারে।

অপবাদ

অপবাদের আভিধানিক অর্থ : অবপাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ কয়েকটি। যেমন : ১. স্পষ্ট মিথ্যা, ২. অপবাদ, মিথ্যা অভিযোগ, ৩. অকল্পনীয় মিথ্যা; যা শুনলে মানুষ হতবাক হয়, ৪. কালিমালেপন/মানহানি, ৫. উদ্দেশ্যমূলক মনগড়া গল্প, ৬. হঠাৎ অপমান বা প্রতিহত করার মতো বক্তব্য, ৭. অযাচিত বিস্ময়কর অভিযোগ, ৮. অন্যায় আঘাত রূপে বাক্য, ৯. নিন্দা বা গিবত-সদৃশ মনগড়া দোষারোপ, ১০. এমন মিথ্যা যা বলনেওয়ালা ও শ্রোতা উভয়কে বিভ্রান্ত করে।

অপবাদের পারিভাষিক অর্থ : অপবাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন :

ইমাম ইবন মনজুর বলেন :

البُهْتَانُ: كُلُّ قَوْلٍ مُخْتَلَقٍ يُنْسَبُ إِلَى الإِنْسَانِ بِلَا حَقٍّ، فَيَبْهَتُهُ لِشِدَّةِ زُورِهِ وَكَذِبِهِ.

"বুহতান হলো এমন প্রতিটি মনগড়া কথা, যা অন্যায়ভাবে মানুষের দিকে আরোপ করা হয়; যার তীব্র মিথ্যাচার ও জঘন্যতার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি হতবাক হয়ে পড়ে। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানি

البُهْتَانُ: ادِّعاءُ الكَذِبِ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ تَشْوِيهُ السُّمْعَةِ، وَهُوَ أَغْلَظُ أَنْوَاعِ الزُّورِ.

"বুহতান হলো এমন মিথ্যা অভিযোগ যা ইচ্ছাকৃতভাবে কারো সম্মানহানি করার উদ্দেশ্যে বানানো হয়। এটি মিথ্যার সর্বোচ্চ ও জঘন্যতম রূপ এবং সমাজে নৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।"

আল-জুরজানি রহ. বলেন :

البُهْتَانُ: نِسْبَةُ مَا لَيْسَ فِي الإِنْسَانِ إِلَيْهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ مَحْضٌ يُقْصَدُ بِهِ الإِذْلَالُ.

"বুহতান হলো : যা মানুষের মধ্যে নেই, তা তার দিকে আরোপ করা। এটি এমন এক ঘোর মিথ্যা যার উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা ও অপমানিত করা। বাস্তবে এর কোনো ভিত্তি নেই।"

ইমাম নববী রহ. বলেন :

البُهْتَانُ: ذِكْرُ الإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ، وَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الغِيبَةِ لِأَنَّهُ افْتِرَاءٌ صِرْفٌ.

"বুহতান হলো : মানুষের মধ্যে যা নেই, তা তার সম্পর্কে বলা। এটি গীবতের চেয়েও গুরুতর, কারণ গীবত সত্য হলেও বলা নিষেধ; কিন্তু বুহতান সম্পূর্ণ বানানো, খাঁটি মিথ্যা ও ঘোর অপরাধ।"

ইমাম ইবন হজর আল-আসক্বালানী রহ. বলেন :

البُهْتَانُ: إِلْصَاقُ الكَذِبِ البَيِّنِ بِالشَّخْصِ حَتَّى يُبْهَتَ لِجَهْلِهِ بِأَصْلِهِ، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الفِرْيَةِ.

"বুহতান হলো স্পষ্ট মিথ্যা আরোপ করে ব্যক্তিকে এমন অবস্থায় পৌঁছানো যে সে নিজেই অবাক হয়ে যায়, কারণ তার কোন ধারণাই থাকে না এই অভিযোগ কোথা থেকে এসেছে। এটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপবাদ।"

ইসলামী বিধানে অপবাদের পরিণতি ও শাস্তি

ইসলাম মানুষে-মানুষে সুসম্পর্ক, নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার জন্য অপবাদকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। কারণ অপবাদ মানুষের সম্মানহানি করে, সমাজে বিভক্তি সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর গজবকে ডেকে আনে। তাই কুরআন ও সুন্নাহতে বুহতানের শাস্তি অত্যন্ত কঠোরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. **অপবাদ মানুষের ইজ্জত লজ্ঘন এবং আল্লাহর কঠোর নিষেধাজ্ঞা :** অপবাদ শুধু একটি ভাষাগত অপরাধ নয়; এটি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম দুনিয়ায় মানুষের সম্মানকে জীবনের মতোই পবিত্র ঘোষণা করেছে। কেউ যখন ভিত্তিহীন অভিযোগ করে, তখন সে মানুষের সামাজিক আস্থা ভেঙে দেয় এবং আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে যায়। অপবাদ সমাজে সন্দেহ, ভীতি ও বিবাদ ছড়িয়ে দেয়। ফলে আল্লাহ তায়ালা এটিকে অত্যন্ত বড় গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। যে ব্যক্তি অপবাদ ছড়ায়, আল্লাহ তার অন্তরে নৈতিকতা ও সত্যবাদিতার আলো নিভিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"তোমরা এমন কথার অনুসরণ করো না, যার সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় এসবই জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা আল-ইসরা, ৩৬)

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাতের ক্ষতি থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।" (সহিহ বুখারি, হাদীস ১০)

২. **ভিত্তিহীন অভিযোগ করা কবিরাহ গুনাহ :** কবিরাহ গুনাহ হলো এমন অপরাধ, যার পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ। অপবাদ দেওয়া বড় গুনাহের মধ্যে অন্যতম। কারণ এটি মিথ্যা, প্রতারণা ও মানুষের মর্যাদা ধ্বংস তিনটি অপরাধ একই সঙ্গে সংঘটিত হয়। যার ফলস্বরূপ আল্লাহর লানত ও আজাব নাযিল হতে পারে। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, বিশেষত সম্মান নষ্ট করা আল্লাহর কঠোর গজবকে টেনে আনে। অপবাদ যদি কারো চরিত্রহানির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, তবে তা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

"যেসব লোক মুমিন পুরুষ ও নারীদের বিনা কারণে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করেছে।" (আল-কুরআন, ৩৩:৫৮)

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, **سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ**

"মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সঙ্গে যুদ্ধ করা কুফরি সদৃশ।" (সহিহ বুখারি, হাদীস ৬০৪৪)

৩. **অপবাদ ঈমানের দুর্বলতার প্রকাশ :** যে ব্যক্তি অন্যের সম্মানে আঘাত করে, সে ঈমানের পরিপূর্ণতা থেকে বঞ্চিত। প্রকৃত মুত্তাকী ও ঈমানদাররা অন্যের দোষ অনুসন্ধান বা মিথ্যা কথার প্রচার করে না। অপবাদ হলো নফস, হিংসা ও গিবতপ্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ। ঈমানের শক্তি যত কমে, ততই মানুষ অন্যকে হেয় করার প্রবণতা অর্জন করে। এ কাজ দ্বারা আল্লাহর ভয় কমে যায় এবং শয়তানের দাসত্ব বাড়ে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا.

"হে মুমিনগণ! অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো; নিশ্চয় কিছু ধারণা গুনাহ। তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না এবং কেউ কারো সম্পর্কে অনুপস্থিতিতে মন্দ কথা বলো না।" (আল-কুরআন, ৪৯:১২)

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ.

"মু'মিন গালিগালাজকারী, লানতকারক, অশ্লীলভাষী ও কষ্টদাতা নয়।" (সুনান তিরমিযি, হাদীস ১৯৭৭)

৪. **অপবাদ সমাজে বিভক্তি ও শত্রুতা সৃষ্টি করে :** সমাজের শান্তি নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণগুলোর একটি হলো অপবাদ। একটি মিথ্যা কথা দুই পরিবারের সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারে। মুসলিম সমাজে ঐক্য বজায় রাখতে সত্য ও সততা

অপরিহার্য। অপবাদ মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যেখানে সন্দেহ, বিবাদ ও শত্রুতা জন্ম নেয়। শয়তান এই মিথ্যা কথা কাজে লাগিয়ে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি নষ্ট করে। তাই ইসলামে অপবাদকে সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.

"তোমরা এমন ব্যক্তির অনুসরণ করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে নিজের কামনার অনুসরণ করে।" (আল-কুরআন, ১৮:২৮)

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ... وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

"তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ করো না, পিঠ ফিরিয়ে দিয়ো না; বরং আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো।" (সহিহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬০)

৫. **কারো চরিত্র নিয়ে অপবাদ দিলে শরিয়তের নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক শাস্তি রয়েছে (হাদ্দ) :** ইসলামে কারো চরিত্রহানি করে অপবাদ (কাযফ) দিলে কঠোর হাদ্দ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। এতে ৮০ কোড়ালের শাস্তি রয়েছে, যা ব্যক্তির মিথ্যাচার ও মানুষের সম্মানহানির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শাস্তি। এ শাস্তি সমাজে মিথ্যা প্রচার ও অপবাদ রোধে বড় ভূমিকা রাখে। যে ব্যক্তি কুযুক্তি বা মিথ্যা লাগায় সে ইসলামী আদালতে অপরাধী গণ্য হয়। এছাড়া তার সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করা হয় না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

"যারা পবিত্র নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী আনতে পারে না, তোমরা তাদের আশি বেত্রাঘাত মারবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।" (আল-কুরআন, ২৪ : ৪)

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ.

"মানুষের ওপর ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ করা বড় ধরনের মিথ্যাচার।" (সহিহ বুখারি, আল-আদবুল মুফরাদ ৭৫৬)

৬. **অপবাদকারীর দোয়া কবুল না হওয়ার ভয় রয়েছে :** দু'আ কবুলের অন্যতম শর্ত হলো হৃদয়ের পবিত্রতা ও অন্যের অধিকার লঙ্ঘন না করা। যে ব্যক্তি মানুষের ওপর মিথ্যা দোষ চাপায়, তার অন্তর কলুষিত হয়ে যায়। অপবাদকারীর অন্তর কৃপা ও ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরে যায়, ফলে তার দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অপবাদ দুনিয়ায় মানুষের হক নষ্ট করে, তাই আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির আমল থেকে বারাকাহ উঠিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.**

"আল্লাহ শুধুমাত্র পবিত্র ব্যক্তিদের কাছ থেকে (আমল) গ্রহণ করেন।" (আল-কুরআন, ৫:২৭)

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

يُطِيلُ السَّفَرَ ... مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ... فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟

"এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, তার দোয়া কীভাবে কবুল হবে?" (সহিহ মুসলিম, হাদীস ১০১৫)

৭. **অপবাদ অন্যের ওপর জুলুম আর জালিমের পরিণাম ভয়াবহ :** অপবাদ সরাসরি জুলুম, কারণ এটি অন্যের অধিকার, সম্মান ও ইজ্জত নষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালা জুলুমকে হারাম করেছেন এবং জানিয়েছেন যে জালিম কখনো সফল হবে না। অপবাদকারীর জুলুম কেবল ভুক্তভোগীকেই নয়; সমাজের বড় অংশকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই আল্লাহর ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এ অপরাধ আখিরাতে কঠিন জবাবদিহি ডেকে আনবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

"অবশ্যই জালিমরা কখনো সফল হবে না।" (আল-কুরআন, ৬:২১)

৮ .**অপবাদকারীর জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রস্তুত আছে :** কিয়ামতের দিন মিথ্যা ছড়ানো ও অপবাদ দেওয়ার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। আল্লাহ ন্যায়বিচারের দিন মানুষের অধিকারগুলো পরিপূর্ণভাবে ফিরিয়ে দেবেন। যার ওপর যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদকারীর কাছ থেকে সওয়াব নেবে; সওয়াব শেষ হয়ে গেলে অপবাদভুক্ত ব্যক্তির গুনাহগুলো তার ওপর চাপানো হবে। এ শাস্তি আল্লাহর কঠোর ন্যায়বিচারের প্রতিফলন।

৯ .**অপবাদকারীর ওপর আল্লাহর লানত ও ফেরেশতাদের ধিক্কার আছে :** মিথ্যা রটনা ও অপবাদ আল্লাহর নীতির সরাসরি বিরোধিতা। আল্লাহ তায়ালা মিথ্যাকে ঘৃণা করেন এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর লানত ঘোষণা করেছেন। যে ব্যক্তি মানুষের সম্মান নষ্ট করার উদ্দেশ্যে কথাবার্তা চালায়, আল্লাহ তার ওপর নিজের রহমত বন্ধ করে দেন। ফেরেশতারাও এমন ব্যক্তিকে ধিক্কার দেয় এবং তার থেকে দূরে থাকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَٰذِبِينَ

"আল্লাহর লানত সেই ব্যক্তির ওপর, যে মিথ্যা বলে।" (আল-কুরআন, ৩:৬১)

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِ

"মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহ ও ফেরেশতারা লানত করেন।" (সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৩১)

১০ .**অপবাদ থেকে তওবা করা বাধ্যতামূলক এবং ক্ষতিপূরণ দিতে হবে :** ইসলামে অপবাদ দেওয়া শুধু আল্লাহর অধিকার নয়; বরং মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ন করার শামিল। তাই এর তওবা কেবল আল্লাহর কাছে নয়, ভুক্তভোগীর কাছেও ক্ষমা

চাইতে হয়। যদি সম্মানহানি হয়ে থাকে, তাহলে তা পূরণ করতে হবে। অন্যথায় তার তওবা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই তাওবা হলো সত্যিকার অনুশোচনা, অপবাদ প্রত্যাহার এবং পুনরায় এ কাজে না ফেরার সংকল্প। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ.

"যে অন্যায় করার পর তওবা করে ও নিজের সংশোধন করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।" আল-কুরআন, ৫:৩৯

অপবাদ এমন একটি অপরাধ, যা একজন মুসলিমের ঈমান, সমাজ, সম্পর্ক ও আখিরাত সবকিছুই ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই কুরআন ও হাদীস এ বিষয়ে কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেছে এবং মুমিনদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের উচিত প্রতিটি কথা যাচাই করে বলা, অন্যের সম্মান রক্ষা করা এবং অপবাদ থেকে দূরে থাকা। তাহলেই আল্লাহর রহমত লাভ করা সম্ভব।

গালি দেওয়া

গালির আভিধানিক অর্থ: গালি শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো : سَبّ। যার আভিধানিক অর্থ :

الشَّتْمُ، وَهُوَ التَّوْبِيخُ وَالتَّقْبِيحُ، وَالسِّبَابُ: الْقَبِيحُ مِنَ الْقَوْلِ

"কাউকে গালি দেওয়া, তিরস্কার করা ও অপমানভরা উচ্চারণ, কুৎসিত এবং অপমানজনক বক্তব্য।"[১]

তাজুল আরূস গ্রন্থে এসেছে,

السَّبُّ: الشَّتْمُ، وَقِيلَ: هُوَ التَّعْيِيرُ وَالتَّوْبِيخُ بِمَا فِيهِ أَوْ لَيْسَ فِيهِ.

"গালি হলো কাউকে তামসীয়ভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে তিরস্কার বা নিন্দা করা, তা সত্যের ভিত্তিতে হোক বা না হোক উদ্দেশ্যই অপমান করা।"[২]

মোটকথা, গালির অর্থ হলো : অন্য কাউকে অবমাননার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলা, যা তাকে হেয় করে, অপমান করে, অথবা অসম্মান প্রকাশ করে। এর মধ্যে থাকে গালি দেওয়া, শাপ দেওয়া, বদদোয়া করা, নিন্দা করা, হেয় করা, ঘৃণাসূচক বা সম্মানহানিকর কথা বলা ইত্যাদি।

ইসলামের দৃষ্টিতে গালিগালাজের শাস্তি

ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিষ্টাচার ও নৈতিকতার ওপর গভীর গুরুত্ব আরোপ করেছে, বিশেষত জিহ্বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। মানুষের মুখের উচ্চারিত শব্দ যেমন শান্তি সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি গালিগালাজ ও অপমান সমাজে বৈরিতা ও বিভেদ তৈরি করতে পারে। কুরআন ও সুন্নাহ জিহ্বার অপব্যবহারকে কঠোরভাবে নিষেধ করে, কারণ এটি মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও হৃদয়ে সরাসরি আঘাত হানে। গালিগালাজ শুধু নৈতিক দোষ নয়; বরং ইসলামী শরীয়তে এটিকে ফাসিকত্ব ও গুরুতর

---

১. ইবন মানযুর, লিসানুল আরব, খ. ২, পৃ. ৫২৩
২. আয-যুবাইদি, তাজুল আরূস, খ. ৩, পৃ. ২৫৪।

পাপ বলা হয়েছে। রাসুল সা. নিজে উচ্চ নৈতিকতার আদর্শ হয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে পরিশুদ্ধ ভাষা মুমিনের চরিত্রের পরিচয় বহন করে। তাই ইসলাম মুমিনের মুখে কঠোর, অশ্লীল ও অপমানজনক ভাষা কখনোই বরদাশত করে না। সমাজে শান্তি, পরিবারে স্নেহ ও ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য। গালিগালাজ থেকে বিরত থাকা শুধু সৌজন্য নয়; বরং ঈমানি দায়িত্ব। এ কারণে ইসলামী গ্রন্থসমূহে গালিগালাজের পরিণতি অত্যন্ত কঠোরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. **কুরআনে অশ্লীল ভাষা ও গালিগালাজের নিষেধাজ্ঞা :** গালিগালাজ, অপমান, অভিশাপ সবকিছুকেই নিষিদ্ধ করে। এ ধরনের আচরণ মানুষে মানুষে ঘৃণা সৃষ্টি করে ও সমাজে দূষণ ছড়ায়। আল্লাহ বলেন:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

"তোমরা নিজেদেরকে (অপরকে) তিরস্কার করো না এবং অপমানজনক উপনামে ডেকো না "[৩]

২. **গালি দেওয়া ব্যক্তিকে ফাসিক বলা হয়েছে :** গালিগালাজ শুধু সাধারণ পাপ নয়; বরং চরিত্রহীনতার চিহ্ন (ফিসক)। একটি শব্দও কারো সম্মানহানি করলে তার অন্তরে বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে, যা সমাজে বিভেদ তৈরি করে। হাদীসটি যেমন ব্যক্তির চরিত্রের মানদন্ড নির্ধারণ করে, তেমনি ইঙ্গিত দেয় যে এমন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং ইসলামে বিচারে তার নৈতিক অবস্থান দুর্বল বলে গণ্য হয়। ফলে গালি দেওয়া শুধুমাত্র শিষ্টাচারের বিপরীত নয়, বরং শরীয়তে অপরাধের পর্যায়ে। রাসূল (সা) বলেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ

"মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসিকত্ব"[৪]

৩. **গালিগালাজকারীর জবানকে কিয়ামতে জবাবদিহি করতে হবে :** গালিগালাজের প্রতিটি বাক্য লিপিবদ্ধ হয় এবং বিচার দিবসে উপস্থাপিত হবে। আলিমগণ বলেন, যেসব শব্দ মানুষ অবহেলায় বলে ফেলে গালি, অভিশাপ, বিদ্বেষ সেগুলো অনেক সময় আল্লাহর কাছে মানুষের আমল ধ্বংসের কারণ হয়। হাদীসে আছে, মানুষ এমন একটি কঠোর বাক্য বলে যে তা তাকে জাহান্নামে ফেলতে পারে। কিয়ামতের দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সা. বলেন যে জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি কথা হিসাবের খাতায় লেখা হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"মানুষ যা কিছু উচ্চারণ করে, তার নিকটেই সদা প্রস্তুত প্রহরী (ফেরেশতা) থাকে।"[৫]

---

৩. আল-কুরআন, ৪৯ : ১১
৪. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৮
৫. সূরা ক্বাফ, ১৮

৪. **গালিগালাজকারীর প্রতি আল্লাহর রহমত কমে যায় :** গালি ও অভিশাপ একই শ্রেণির; দুটিই অন্যের ক্ষতি চাওয়া। একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করা ইবাদত, আর তাকে ক্ষতির দোয়া করা বড় অপরাধ। তাই গালিবাজ মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। অভিশাপের অভ্যাস গড়ে উঠলে হৃদয়ের কঠোরতা বাড়ে, দয়া কমে যায়, এবং আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরে যায়। ইসলামী আখলাকের দৃষ্টিতে চরিত্রের এই অবনতি মানবিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। নবী (সা) বলেছেন,

لَعَنَ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ

"মুমিনকে অভিশাপ দেওয়া তাকে হত্যা করার সমান "[৬]

৫. **গালিগালাজকারীকে নবী সা. নিষিদ্ধ করেছেন :** আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, "নবী সা. কখনো গালি দিতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, কারো উপর অভিশাপ দিতেন না।"[৭]

৬. **গালিগালাজকারী সমাজে ফিতনা সৃষ্টি করে :** এটা ইসলামের সামাজিক নীতিমালার ভিত্তি। অপমানজনক গালাগাল ক্ষতি হিসেবে শাস্তিযোগ্য। ইসলামী আদালত পরিস্থিতি অনুযায়ী তা'আযীর শাস্তি (সামাজিক শাস্তি, অর্থদন্ড, কারাদন্ড বা সতর্কতা) দিতে পারে। সুতরাং গালিগালাজ আইনগতভাবে অপরাধ এবং ইসলামী রাষ্ট্রে এ অপরাধের বিচার করা হয় মানুষের সম্মান রক্ষার স্বার্থে। আর গালিগালাজ শুধু ব্যক্তিগত অপরাধ নয়; বরং সামাজিক অশান্তির কারণ। আল্লাহ বলেন:

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো "[৮]

৭. **গালি দিলে ফেরেশতারা তাকে অভিশাপ করে :** দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া দেখালেও মূল গুনাহ প্রথম গালিবাজের ওপরই থাকে। কারণ ফিতনা সে-ই শুরু করেছে। ফেরেশতারা তার জন্য বদ-দোয়া করে এবং তার আমল থেকে সওয়াব কমে যায়। তাই গালিগালাজ শুধু মুহূর্তের উত্তেজনা নয় বরং আখিরাতের ক্ষতিকর বোঝা। নবী (সা) বলেছেন,

الْمُتَسَابَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ

"দুই জন পরস্পর গালাগালি করলে যে শুরু করেছে, গালিগুলোর গুনাহ তার ওপরই বর্তায়।"[৯]

৮. **পরিবারের ভিতরে গালিগালাজ করলে এর শাস্তি আরও কঠোর :** পরিবারে গালিগালাজ করা দ্বিগুণ অপরাধ। একটি অশ্লীল ভাষার জন্য, আরেকটি সম্পর্ক নষ্ট

---

৬. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ১১০
৭. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ২৫৯৯
৮. সূরা বাকারা,৮৩
৯. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৫৮৭

করার জন্য। পরিবার হলো দয়া ও মহব্বতের কেন্দ্র; সেখানে কঠোর ভাষা সন্তানদের মনস্তত্ত্বে ক্ষত সৃষ্টি করে, দাম্পত্যে বিভেদ আনে। তাই শরীয়তে পরিবারের প্রতি কষ্ট দেওয়া হারাম, এবং বিচার দিবসে এর জন্য বিশেষ জবাবদিহি করতে হবে। তাই পারিবারিক সম্পর্কে সদ্ব্যবহার বাধ্যতামূলক। রাসূল (সা) বলেছেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম "[১০]

ইসলামের দৃষ্টিতে গালিগালাজ এমন একটি পাপ, যা মানুষের হৃদয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সম্পর্ক ভেঙে দেয় এবং সমাজকে অস্থির করে তোলে। কুরআনের নির্দেশ ও নবী (সা) এর জীবনযাপন স্পষ্ট করে যে মানুষের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা ঈমানের অংশ। একজন মুমিনের কর্তব্য হলো শুদ্ধ ভাষার চর্চা করা, গালি থেকে তাওবা করা এবং অন্যের সম্মান রক্ষা করা।

চেহারা বিকৃতি

মানবদেহ আল্লাহর আমানত। আল্লাহ মানুষকে "**أحسن تقويم**" সর্বোৎকৃষ্ট রূপে সৃষ্টি করেছেন। তাই উদ্দেশ্যহীনভাবে বা সৌন্দর্যের জন্য প্রাকৃতিক অঙ্গ পরিবর্তন, কেটে ফেলা, বিকৃত করা বা ক্ষতিগ্রস্ত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কুরআনে শয়তানের অন্যতম প্রতিশ্রুত অপরাধ হলো মানুষের আল্লাহ-প্রদত্ত সৃষ্টি-রূপ পরিবর্তন করা। হাদীসে রাসুল সা. কসমেটিক উদ্দেশ্যে চেহারা পরিবর্তনকারী নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন। চেহারা বিকৃতি, ট্যাটু, দাঁত ঘষা, নাক-কান কাটা বা অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত করা ইত্যাদি কাজ শরীয়ত অনুযায়ী পাপ এবং অনেক ক্ষেত্রে গুনাহে কবীরা।

সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চেহারা বা শরীর বিকৃত করা

ট্যাটু, ভ্রু শেভ, দাঁত ঘষা এধরনের কাজে রাসুল সা.-এর অভিশাপ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَعَنَ النَّبِيُّ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ.

"নবী সা. ট্যাটু করা ও করানোকারিণীদের, ভ্রু তোলা ও তুলানোকারিণীদের, সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের ফাঁক করা নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে।"[১১]

মুখে দাগ দেওয়া নিষিদ্ধ (মানুষ তো আরও বেশি সম্মানিত)। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ

"রাসুল সা. প্রাণীর মুখে দাগ দিতে নিষেধ করেছেন।"[১২]

প্রাণীর মুখ বিকৃতি নিষিদ্ধ হলে মানুষের চেহারা নষ্ট করা আরো গুরুতর নিষেধ।

---

১০. তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৮৯৫
১১. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৫৯৩১
১২. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২১১৭

শরীর নষ্ট করা নিষেধ। এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"ক্ষতি করা ও ক্ষতির প্রতিদান দেওয়া উভয়ই নিষিদ্ধ।"[১৩]

নিজেকে বিকৃত করা নিজের প্রতি ক্ষতি, তাই হারাম।

আল্লাহ মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট রূপে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

"নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।"[১৪]

পরিবর্তন বা বিকৃতি করা এই নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

ইমাম নববী **المنهاج شرح صحيح مسلم**-এ বলেন:

وأما فعل ذلك لِزِينَةٍ فَهُوَ حَرَامٌ، لِأَنَّهُ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللهِ

"সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে এমন পরিবর্তন হারাম; কারণ এটি আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা।"[১৫]

ইমাম ইবনে হাযর রহ. বলেন :

الْمُتَفَلِّجَاتِ هن اللواتي يُغَيِّرْنَ خِلْقَةَ اللهِ لِلْحُسْنِ، وهو حرام

"সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্টির আকৃতি পরিবর্তন করা হারাম।"[১৬]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. বলেন :

تغيير خلق الله يدخل فيه كل ما كان لغير حاجةٍ شرعية

"শরীয়তসঙ্গত প্রয়োজন ছাড়া সকল সৃষ্টির পরিবর্তন নিষিদ্ধের অন্তর্ভুক্ত।"[১৭]

ইসলামে মানবদেহকে সম্মান ও সংরক্ষণ করা এক গুরুত্বপূর্ণ বিধান। চেহারা বিকৃত করা, সৌন্দর্যের জন্য প্রাকৃতিক অঙ্গ পরিবর্তন করা, ট্যাটু বা অঙ্গহানি সবই " **تغيير خلق الله** " অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করার ভেতরে পড়ে, যা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। রাসুল সা. এসব কাজকারীদের প্রতি লানত করেছেন, যা গুনাহের ভয়াবহতার প্রমাণ। তবে চিকিৎসাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ পুনরুদ্ধার বা জন্মগত ত্রুটি সংশোধন করা শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ এবং কখনো প্রয়োজনীয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি; তাই চেহারা সংরক্ষণ করা ইবাদতেরই অংশ। শরীর বিকৃত না করে আল্লাহর সৃষ্টিকে সম্মান করা ইমানদারের পরিচয়।

ছেলের ছবি মেয়ে ও মেয়ের ছবি ছেলে সাজিয়ে ব্যবহারের ইসলামী বিধান

এ ক্ষেত্রে দুইটি শরয়ি সমস্যা রয়েছে : (১) নারী-পুরুষের পরস্পরের অনুকরণ (**تشبه**) ও (২) প্রতারণা ও ধোঁকা (**غشّ**) ইসলামে উভয়টিই নিষিদ্ধ।

---

১৩. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং-২৩৪১
১৪. সূরা আত-তীন, ৪
১৫. আন-নববী, শরহ মুসলিম, খ. ১৪, পৃ. ১০৬
১৬. ইবন হাজার, ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৩৭৮
১৭. ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ আল-ফাতাওয়া, খ. ২১, পৃ. ১২০

নারী-পুরুষের পরস্পরের অনুকরণ নিষিদ্ধ

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

حديث ابن عباس ﷺ قَالَ":لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ"

"রাসূলুল্লাহ সা. সেই পুরুষদের ওপর লা'নত করেছেন যারা নারীদের সাদৃশ্য ধারণ করে এবং সেই নারীদের ওপর যারা পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।"[১৮]

সোস্যাল মিডিয়ায় নিজের প্রকৃত লিঙ্গ লুকিয়ে বিপরীত লিঙ্গের রূপ ধারণ করা এই নিষিদ্ধ তাশব্বুহের অন্তর্ভুক্ত।

দেহভঙ্গি, পোশাক, রূপ সবই নিষিদ্ধ অংশে অন্তর্ভুক্ত

হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

حديث أبي هريرة ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" :ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ... وَلَا الدُّيُوثُ ... وَلَا الرَّجُلُ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ"

ইমাম নাওয়াবী বলেন : **التشبه يعمّ اللباس والحركات والكلام والزينة**

"তাশব্বুহ বা অনুকরণ পোশাক, চলাফেরা, কথা বলা, সাজসজ্জা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।"

বর্তমানে সোস্যাল মিডিয়ার প্রেক্ষাপটে ছেলের ছবি মেয়ে সাজানো, মেয়ের ছবি ছেলে সাজানো, ভুয়া লিঙ্গে ভিডিও বানানো, ভুয়া লিঙ্গে প্রোফাইল খোলা, বিপরীত লিঙ্গের ভয়েস, স্টাইলে অভিনয় করা ও বিপরীত লিঙ্গ হিসেবে চ্যাট করা এগুলো সবই "তাশব্বুহ" যা শরীয়াতে হারাম।

অপবাদ, গালিগালাজ এবং চেহারার বিকৃতি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ হলো মানবমর্যাদা ও সামাজিক শান্তির সুরক্ষা। অপবাদের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এজন্য যে, যেন কেউ ইচ্ছেমতো কারও চরিত্রহনন করতে না পারে। গালিগালাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে মানুষের সম্মান ও পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় রাখতে। চেহারার বিকৃতি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ এসেছে আল্লাহর সৃষ্টিকে সম্মান করার নৈতিকতার অংশ হিসেবে। এসব বিধান সমাজকে অপবাদ, অশালীনতা এবং অনৈতিক সৌন্দর্যচর্চার ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখতে সহায়তা করে। একজন মুসলিমের উচিত তার কথা, আচরণ ও বাহ্যিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ মানা। এভাবে ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ইসলামি নৈতিকতা বাস্তব জীবনে স্পষ্ট ও উপকারী পথনির্দেশনা দেয়। ■

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, মুন্সিগঞ্জ।

১৮. বুখারি, আস-সহীহ, হাদীস নং-৫৮৮৫

৪৮ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

আগামী দিনের জীবন বিধান

সাইয়েদ কুতুব

বস্তুবাদী সভ্যতার চাকচিক্য দেখে বিভ্রান্ত ও ধ্বংসের দিকে ধাবমান মানবতার মুক্তিসনদ হিসেবে যখন ইসলাম স্বীকৃত, বস্তুগত উন্নতি ও আত্মিক উন্নতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে যখন কেবল ইসলামই সক্ষম এবং অন্যান্য জীবন ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন অথচ বাস্তবধর্মী একটা জীবন পদ্ধতি দেবার যোগ্যতা যখন শুধু ইসলামেরই আছে, তখন ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ওপর যারা অত্যাচার নিপীড়ন চালায় তারা মানবতার বিরুদ্ধে কতো বড়ো জঘন্য অপরাধ করছে তা সহজেই অনুমেয়। এসব অপরাধীদের মধ্যে ডালেস সাহেবও একজন। তিনি মানবজাতিকে সতর্কবাণী শুনিয়েছেন। একটা আদর্শ ও কল্যাণকর ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি ইসলামী ব্যবস্থার গুণাবলী ও বৈশিষ্টগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং ইসলামের শক্তিমত্তার প্রতিরোধের প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। ত্রাণ-প্রার্থী মানুষগুলোর মনকে ইসলামের প্রতি বৈরীরূপে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি মিথ্যা অভিযোগ ও মিথ্যা যুক্তি প্রচার করে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু এই প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ প্রচার যুদ্ধ পরিচালনা সত্বেও আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইসলামই হচ্ছে আগামী দিনের জীবন বিধান। কোন মিথ্যা প্রচারণাই আমাদের এই অবিচল আস্থা বিনষ্ট করতে পারবে না।

অতীতের দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইমলামকে আগে আজকের চেয়েও বেশী তীব্র ও নৃশংস আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। ইসলাম নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছে এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই তার অনুসারীদেরকে এবং তাদের দেশগুলোকে সংরক্ষণ করে এসেছে। ইসলাম মুসলিম দেশগুলোকে তাতার ও খৃস্টান ক্রুসেডারদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। যদি তাতার ও খৃস্টান ক্রুসেডারগণ লড়াইতে বিজয়ী হতে পারতো তাহলে খৃস্টানদের হাতে স্পেনের এবং ইহুদীদের হাতে ফিলিস্তিনের মুসলিমদের মতো কোন জাতি বাঁচতে পারতো না। অতীতের স্পেন এবং আজকের ফিলিস্তিনের ঘটনা প্রমাণ করে যে

কোন এলাকা থেকে ইসলাম বিতাড়িত হলে, সাথে সাথে সেই এলাকার ভাষা এবং জাতীয় পরিচিতিও বিদায় গ্রহণ করে।

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে ইসলামী দেশগুলো থেকে তাতারদেরকে তাড়িয়ে ছিলো মামলুকগণ। অথচ এই মামলুকেরা আরব বংশীয় ছিলো না। তারা ছিলো তাতারদেরই সমগোত্রীয়। যেহেতু তারা মুসলিম ছিলো সেহেতু ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্যে স্ব-গোত্রীয় তাতারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ইমাম তাইমিয়ার অনুপ্রেরণা তাদেরকে ইসলামের জন্যে সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

সালাহউদ্দীন ইসলামী এলাকার প্রতিরক্ষার মাধ্যমে আরব ও আরবদের ভাষাকেও রক্ষা করেছিলেন। তিনি নিজে আরব ছিলেন না। ছিলেন একজন কুর্দ। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদের ফলে ইসলামী রাষ্ট্র রক্ষা পেলো রক্ষা পেলো আরবদের ভাষা ও সংস্কৃতিও। আল জাহের বাইবার্স, আল মুজাফফর কুঞ্জ এবং আল মালিক আন নাসীর যেভাবে ইসলামী ভাবধারায় উদ্দীপিত হয়ে তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন, গাজী সালাহউদ্দীনও সেভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

আলজিরিয়া একশ' পঞ্চাশ বছর ফরাসীদের অধীনে থেকে স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতি হারাতে বসেছিলো। ফরাসী সরকার আলজিরিয়াতে আরবী ভাষাকে বিদেশী ভাষা আখ্যা দিয়ে তার শিক্ষাদান বন্ধ করে দিয়েছিলো। সেদিন আলজিরিয়ার বুকে ইসলামই মাথা উঁচু করে দাঁড়ালো উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত মুসলিমগণ ফরাসী বাহিনীকে নতুন ক্রুসেডার বাহিনী মনে করলো এবং জিহাদে নেমে পড়লো। ইসলামী চেতনাই আলজিরিয়াবাসীর স্বাধীনতার অনুভূতি বাঁচিয়ে রেখেছিলো। পরবর্তীকালে আবদুল হামিদ বিন বাদিস - এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলন এই চেতনাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। আলজিরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের এটা হচ্ছে অন্তর্নিহিত সত্য। অনেকেই এই সত্যকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফরাসী ক্রুসেডারদের কাছে এই সত্য দিবালোকের মতো পরিষ্কার। আলজিরিয়ার যুদ্ধে ইসলামী চেতনাই ফরাসীদের বড়ো বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাই ফরাসীরা তাদের যুদ্ধ আরব বা আলজিরীয়দের বিরুদ্ধে ঘোষণা না করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলো।

ইসলামী চেতনা আল মাহদীকে নীল উপত্যকায় (মিসর) ব্রিটিশ দখলের বিরুদ্ধে জিহাদে নামিয়েছিলো। সুদানের মুক্তির জন্যে তাঁকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামিয়েছিলো এই ইসলাম আল - মাহদীর ঘোষণাবলী এবং ইসমান দাকনার বাণীগুলো যেগুলো তাঁরা কিচেনার, ক্রোমার ও তাওফিকের নিকট প্রেরণ করেছিলেন ইসলামী চেতনার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

সিরেনাইকা (Cyrenaica) ও ত্রিপোলিটানিয়াতে ইতালীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো ইসলাম। সানৌসীদের সব ফাঁড়ি ও মসজিদ থেকে প্রতিরোধ সূচিত হলো এবং উমার আল মুখতারের জিহাদ শুরু হলো।

মরক্কোর প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন এই ইসলামী চেতনা থেকেই উৎসারিত। ফরাসী শাসকগণ কর্তৃক প্রণীত ১৯৩১ খৃস্টাব্দের "বারবার আইন" বারবার সম্প্রদায়কে ইসলামী শরীয়াহর বাইরে নিয়ে আসতে চাইলো। অধার্মিকতা ও খোদাদ্রোহিতার দিকে বারবারদেরকে ঠেলে দেয়ার চক্রান্ত হলো। পরিণামে ফরাসীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। জাগ্রত মুসলিম জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

যুগ যুগ ধরে ইসলামের এই লড়াই চলেছে। কিন্তু মারাত্মক মারণাস্ত্রের অধিকারী না হয়েই সে এই লড়াই করে এসেছে। ইসলামের আসল শক্তি এর অনাবিলতা, স্বচ্ছতা ও সার্বজনীনতার মাঝে লুক্কায়িত। এই শক্তি মানব-পূজার অস্বীকৃতি এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদাত থেকে উৎসারিত। এটা এমন এক শক্তি যা মুসলিম হৃদয়ে উৎপীড়ন - নিপীড়নের মুখেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মানসিকতা সৃষ্টি করে। ইসলাম যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির অন্তর ও বিবেকে বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিক ও আপাতঃ পরাজয় ঘটা সত্বেও সেই ব্যক্তির আত্মিক পরাজয় ঘটে না।

এই গুণপনা আছে বলেই ইসলামের দুশমনেরা এর বিরুদ্ধে অবৈধ যুদ্ধ পরিচালনা করে চলছে। ইসলাম তাদের পথের কাঁটা। অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার, যুলুম - নির্যাতন পরিচালনা এবং সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার পথে ইসলামই হচ্ছে বড়ো বাধা। এই কারণেই এর বিরুদ্ধে এতো জঘন্য প্রচারণা। ইসলামের বিকল্প হিসেবে তারা অন্যান্য মূল্যবোধ মেনে নিতে প্রস্তুত। এরা ইসলামের শক্তিতে ভেজাল মেশাবার চেষ্টাও করেছে। এরা ইসলামকে দুর্বল করতে চায় যাতে আন্ত র্জাতিক ইহুদীবাদ, আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার বাহিনী এবং সাম্রাজ্যবাদ এর ওপর বিজয়ী হতে পারে।

ইসলামের অজেয় মৌলিক গুণাবলী ইসলামের শত্রুদের হিংসার কারণ। ইসলামী দেশ ও এগুলোর সম্পদ-শক্তি যারা লুণ্ঠন করতে চায় তাদের কাছে ইসলামের এই গুণটি অসহনীয়। একদিকে যুদ্ধ পরিচালনা, অপরদিকে মিথ্যা প্রচারণার এটাই আসল কারণ। বিরোধিতার এটাই মূল।

এতদসত্ত্বেও এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতকাল এই ধর্মের জন্যে নির্ধারিত।

"এই ধর্মীয় ব্যবস্থার সুউচ্চ ও মহান পরিকল্পনা এবং এমন একটা ব্যবস্থার জন্যে মানবজাতির স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি যে ইসলামই হচ্ছে আগামী সভ্যতার জীবন বিধান। এক নজীরবিহীন

ভূমিকা পালনের জন্যে সে আপ্লুত হবে। কেননা ইসলামের শত্রুরা স্বীকার করুক আর না-ই করুক এই ভূমিকা অপর কোন ধর্ম বা মতবাদ দ্বারা পালিত হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি গোটা মানবজাতি আর অধিককাল ধরে এই ধর্মকে এড়িয়ে থাকতে পারবে না। আত্মরক্ষার মহা তাকিদেই মানুষ একে গ্রহণ করবে।"

এই প্রসঙ্গে আসুন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা পরখ করি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকর (রা) গোপনে মদীনায় হিজরত করছিলেন। সুরাকা ইবনে মালিক তাঁদের অনুসরণ করছিলো। সুরাকা বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ছিলো। কিন্তু সে দমলো না। কুরাইশগণ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীকে যে ধরে দিতে পারবে তাকে বড়ো রকমের ইনাম দেবে বলে ঘোষণা করেছে। এই ইনামের লোভে সুরাকা বার বার হোঁচট খাওয়া সত্বেও সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকলো। কিন্তু সে মুহাম্মাদকে (সা) ধরে ফেলার মতো নৈকট্যে পৌঁছতে পারছিলো না। সে তখন পিছু ফিরতে মনস্থ করলো। এই সময় বিশ্বনবী (সা) বললেন, "ওহে সুরাকা, তুমি কি শাহের ব্রেসলেটের মালিক হওয়া পছন্দ করবে?" অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সা) সুরাকাকে পারস্যের বাদশাহর ব্রেসলেট দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। আল্লাহ-ই জানেন একজন মাত্র সঙ্গী সাথে নিয়ে হিজরতকারী ব্যক্তিটির এই প্রতিশ্রুতি শুনে সুরাকা কি ভেবেছিলো।

কিন্তু মুহাম্মাদ (সা) জানতেন তিনি সত্য পথে আছেন এবং অবিশ্বাসীরা আছে মিথ্যে পথে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ন্যায় ও সত্য অন্যায় ও অসত্যকে পরাভূত করবেই। অন্যায় ও অসত্য দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। অসত্য সেদিন পানি ও সারবিহীন একটা গাছের মতো নেতিয়ে পড়ছিলো এবং অচিরেই এর মূল পচে ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো। পক্ষান্তরে আল্লাহর রাসূল সত্যকে দেখছিলেন একটা তাজা বীজের মতো যা অঙ্কুরিত, বৃক্ষে পরিণত এবং ফুলে-ফলে শোভিত হবার সম্ভাবনা ছিলো। এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না।

আজ আমরা তেমনি একটা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি। আমাদের চারদিকে প্রাক ইসলাম যুগের জাহিলিয়াত এর অবধারিত পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি হবার অবকাশ নেই। আমাদের চারদিকে বিরাজমান পরিবেশের অনিবার্য পরিণতিরূপেই তা ঘটবে।

আজকের মানুষের জন্যে ইসলামের প্রয়োজন রাসূলুল্লাহর (সা) যুগের মানুষের জীবনে ইসলামের প্রয়োজনের মতোই তীব্র। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে এমনি এক পরিস্থিতিতে অতীতে যা ঘটেছে, আজকে বা আগামীতেও তাই ঘটবে। বস্তুবাদী সভ্যতার প্রসার ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ওপর যুলুম নির্যাতন চলা

সত্বেও আমাদের মনে যেন সংশয়বাদ সামান্যতম রেখাপাত না করতে পারে। ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য অন্যায় ও অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, এটা সত্য। কিন্তু সত্যের শক্তি ইসলামের পক্ষে সব প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার চড়াই-উত্রাই পেরিয়ে কালজয়ী হবার সামর্থ্য আছে ইসলামের।

আমরা একা নই। প্রকৃতি আমাদের পক্ষে। অস্তিত্বের প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতি মহাশক্তিধর। এই শক্তি সভ্যতার অপরাপর শক্তির চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যখন সংঘর্ষ বাধে তখন সংঘর্ষকাল যত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হোক না কেন প্রকৃতি বিজয় লাভ করে।

এখানে একটি বিষয় আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সম্মুখে রয়েছে এক দীর্ঘ সংগ্রাম মানব রচিত সব মতবাদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি কায়েমের তিক্ত ও কষ্টকর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের জন্যে আমাদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। নিজেদেরকে সত্য ধর্মের দাবী অনুযায়ী উন্নত করে নিতে হবে। আল্লাহ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ তাঁর সুস্পষ্ট পরিচিতি না জানতে পেলে আমরা পরিপূর্ণভাবে ও সচেতনভাবে তাকে বিশ্বাস করতে পারবো না। আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহর প্রতি গভীর প্রত্যয় স্থাপন করে সমুন্নত হতে হবে।

পারিপার্শ্বিকতাকে ভালভাবে বুঝতে হবে। সমসাময়িক কালের উপায় উপকরণ ও কর্মপদ্ধতির অবগতি থাকতে হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি তাঁর কৃপা বর্ষণ করেন যারা সময়ের প্রবাহকে উপলব্ধি করে এবং সিরাতুল মুস্তাকীমে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকে। আজকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা এগুলোর প্রয়োজনীয় দিকগুলোকে গ্রহণ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করবো। নির্ভুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে আমরা এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় গ্রহণ বা বর্জন করবো।

মানব অস্তিত্বের উৎস আমাদেরকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে সেসব জিনিষ যেগুলো তাকে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাতে সক্ষম। এই আলোকে আমরা বর্তমান সভ্যতার সবকিছু বিশ্লেষণ করে এগুলো সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভংগি স্থির করবো।

ইসলামকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নিঃসন্দেহে দীর্ঘ এবং কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই সংগ্রাম এক পবিত্র ও মহান সংগ্রাম। এই পথে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

"আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।" - সূরা ইউসূফ। ■

বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন ব্রাজিল

মীযানুল করীম

হেগ, প্যারিস, আমস্টারডাম, এডিন বার্গের পরে ব্রাজিলের বেলেম শহরে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল এবার। রাজনীতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সংসদীয় রাজনীতির মতো জলবায়ু রাজনীতি আজকে প্রচলিত। পরিবেশ নিয়ে এক ধরনের খেলা চলছে। দূষণ, জলবায়ু, পরিবেশ ইত্যাদি এ রাজনীতির শব্দ। পরিবেশ নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে অন্য রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব। বিগত সম্মেলনগুলোর মতো এ সম্মেলনেও ছিল রাজনীতির প্রাধান্য। তবে শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। ব্রাজিলও বেশ সুনাম কুড়িয়েছে।

২৫ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত

১০ নভেম্বর ব্রাজিলের বেলেম শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন 'কপ-৩০' অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। জাতিসংখ জলবায়ু সংকটের ভয়াবহতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১ দশকে ২৫ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

এবারে সম্মেলনের দায়িত্বে ছিলেন ব্রাজিলের আন্দ্রে কোরেরা দো লাগো। কোরেরা বলেছেন, জলবায়ু সংকটের জন্য দায়ী ধনী দেশগুলোই এই সংকট নিরসনের লড়াইয়ে আগ্রহ হারিয়েছে।

মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়া নিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে, জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর। এতিবেদন অনুযায়ী, ১০ বছর ২৫ কোটি হিসেবে প্রতিদিন বাস্তুচ্যুত হয়েছে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ। এই বিপুলসংখ্যক মানুষের ঘরবাড়ি ত্যাগের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নিতে 'কপ-৩০' প্রতিনিধিদের প্রতি আহবান জানিয়েছে ইউএনএইচসিআর।

'নো স্কেপ-২: দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড' বা পালানোর পথ নেই-২; আগামীর দিশা' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বন্যা, ঝড়, খরা ও তীব্র তাপমাত্রার মতো আবহাওয়ার পরিস্থিতির কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঘটনা ও সংঘাত বাড়ছে। পাশাপাশি আঘাত হানা বিভিন্ন দুর্যোগ, যেমন বন উজাড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, বাস্তুসংস্থান ধ্বংস, খাবার ও পানির নিরাপত্তা হুমকির মুখে ফেলছে।

ইউএনএইচসিআর জানিয়েছে, সংঘাত ও জলবায়ুর কারণে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন- এমন দেশের সংখ্যা ২০০৯ সাল থেকে তিন গুণ হয়েছে। এরপরও দুর্দশাগ্রস্থ ও সংঘাতে জর্জর যেসব দেশে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছেন, ওই দেশগুলো প্রযোজনের চার ভাগের এক ভাগ জলবায়ু সহায়তা পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা না রেখেও বাস্তুচ্যুতদের অনেক সময় দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হচ্ছো। চরম জলবায়ুজনিত বিপর্যয়ে আক্রান্ত দেশ সমূহে বসবাস করছেন বাস্তুচ্যুত মানুষের চার ভাগের তিন ভাগ। এ ছাড়াও ২০২৪ সালে ইউএনএইচসিআর যতবার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল, তার তিন ভাগের এক ভাগের কারণ ছিল বন্যা, খরা, দাবানলসহ অন্যান্য চরম আবহাওয়া সংক্রান্ত ঘটনা।

উদাহরণ হিসেবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের মে মাসে লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলের রিও গ্রানদে দো সুল রাজ্যে ভয়াবহ বন্যার কথা। ওই বন্যায় ১৮১ জনের মৃত্যু হয়। বাস্তুচ্যুত হয় ৫ লাখ ৮০ হাজার মানুষ। এর মধ্যে এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের ৪৩ হাজার শরণার্থী ছিল। এশিয়ার দেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে আঘাত হানে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় 'মোর্চা, ২০২৩ সালে।

আফ্রিকার দেশ চাদে ১৪ লাখের বেশি শরণার্থী ও আশ্রয় প্রার্থী বসবাস করে। শুধু ২০২৪ সালেই বন্যার কারণে দেশটিতে ১৩ লাখের বেশি মানুষ নিজেদের বাড়িঘর ও আশ্রয়শিবির ছাড়তে বাধ্য হয়। সুদানের শরণার্থীরা প্রতিদিন ১০ লিটারের কম পানি পাচ্ছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। সব মিলিয়ে আফ্রিকার ৭৫ শতাংশ ভূখণ্ডের অবস্থা খারাপ হচ্ছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে আবহাওয়া পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। ২০৪০ সাল নাগাদ চরম জলবায়ু বিপর্যয়ের মুখে পড়া দেশের সংখ্যা ৩ থেকে বেড়ে ৬৫-তে পৌঁছাতে পারে। আর ২০৫০ সাল নাগাদ গাম্বিয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, সেনেগাল ও মালির ১৫টি শরণার্থী শিবির বছরে প্রায় ২০০ দিন বিপর্যয়কর তাপমাত্রার মুখে পড়তে পারে।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি বলেন, 'চরম জলবায়ুর প্রভাব থেকে শরণার্থী ও বাস্তুচ্যুত পরিবারবকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে তহবিলে কাটছাঁট। আমরা যদি স্থিতিশীলতা চাই, তাহলে মানুষ যেখানে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে, সেখানে বিনিয়োগ করতে হবে। বাস্তুচ্যুত হওয়া থামাতে জলবায়ু তহবিল সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে।'

'কপ-৩০' সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন ১৯৪ দেশের প্রতিনিধিরা। প্যারিস চুক্তিতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার যে ঐকমত্য হয়েছিল, সে বিষয়ে আলোকে করেছেন তাঁরা। একই সঙ্গে, কীভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার

বন্ধ করা যায় এবং দরিদ্র দেশ গুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া যায়, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এসব বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করে ব্রাজিলের কুটনীতিক আন্দ্রে কোরেরা দো লাগো বলেন, 'জলবায়ু সংকটের জন্য দায়ী ধনী দেশগুলো এই সংকট নিরসনের লড়াইয়ে আগ্রহ হারিয়েছে। তবে ভালো করছে চীন। দেশটি সবচেয়ে বেশি গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন করলেও পাশাপাশি, পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির সবচেয়ে বড় উৎপাদনকারী। অন্য দেশগুলোকে এটি অনুসরণ করতে হবে।

পুরোনো ব্যর্থতা শুধরে নেয়া

এবারের সম্মেলনে পুরোনো প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে আয়োজক দেশ ব্রাজিল। পুরোনা ব্যর্থতা শুধরে নেওয়ার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কপের পূর্ণ রূপ হলো 'কনফারেন্স অব দ্য পার্টিস।'

এর সদস্যদেশগুলো ১৯৯২ সালে একটি অন্তর্জাতিক চুক্তিতে সই করে। চুক্তিটি দ্য ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি)। বিশ্ব জলবায়ু ব্যবস্থাকে মানুষের বিপজ্জনক তৎপরতা থেকে রক্ষা করাই লক্ষ্য। প্রথম সম্মেলন হয় জার্মানির বার্লিনে, ১৯৯৫ সালে।

এবরের ৩০তম কপ চলেছে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। সভাপতিত্ব করা দেশ হিসেবে ব্রাজিলের আলাদা একটি গুরুত্ব। ৩৩ বছর আগে দেশটির রিও ডি জেনিরো শহরে একটি সম্মেলনে ইউএনএফসিসিসি চুক্তি সই হয়েছিল। স্বাক্ষরকারী দেশগুলো যে অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে, সে জন্য সম্মেলনে কিছু বিষয়সূচিও নির্ধারণ করেছে ব্রাজিল।

কপ-২৮-এ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের উপর এবার জোর দিচ্ছে ব্রাজিল।

এ বৈশ্বিক উষ্ণতা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি না বৃদ্ধির যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টি প্রথমবারের মতো স্বীকার করা হয় এবং সমাধানে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বেলেম শহরে আমাজন জঙ্গলের অংশ রয়েছে। সম্মেলনের জন্য এই শহর বেছে নেওয়ার পেছনেও কারণ রয়েছে।

তা হলো, বিশ্বে বনভূমির গুরুত্ব তুলে ধরা। নানা পদক্ষেপ দেওয়ার পরও বিশ্বজুড়ে বনভূমি উজাড় হচ্ছে। একই সঙ্গে খনিজ সম্পদ উত্তোলন, কৃষিকাজ ও জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলনের মতো শিল্পায়ন-সংক্রান্ত বিভিন্ন খাতের হুমকির মুখে পড়ছে বনাঞ্চল।

সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা

কয়েকটি দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমানোসহ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহ দেখিয়েছে কপ-৩০ সম্মেলনে। জলবায়ু সংকট নিরসনে ধনী দেশগুলোর আর্থিক

দায়বদ্ধতার বিষয়টিও আলোচনায় তোলা হয়েছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা চালিয়েছে ব্রাজিল।

ওই পদক্ষেপগুলো আগের সম্মেলনগুলোতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছিল। বেলেম শহরে কপ সম্মেলনে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ নিয়ে ব্রাজিল অনানুষ্ঠানিকভাবে আলাপ এবং সমঝোতার মাধ্যমে এক গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য মধ্যস্থতা করে- এমন প্রতিশ্রুতির পর আলোচনা পেছানো হয়েছিল। আলোচনার জন্য চারটি বিষয় বিবেচনায় রয়েছে। সেগুলো বাণিজ্য, স্বচ্ছতা, জলবায়ুসংক্রান্ত অর্থায়নের দায়বদ্ধতা ও তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে এমন গ্যাস নিঃসরণ কমানো। শেষের দুটি বিষয় বেশি সংবেদনশীল। ধনী দেশগুলো আর্থিক সহায়তা নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী নয়। জলবায়ু পরিবর্তনে জীবাশ্ম জ্বালানির দায় নিয়ে আলোচনা চায় না তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো।

সম্মেলনের ফাঁকে দুই দিন ধরে বিষয় দুটি নিয়ে আলোচনার পর দেখার পালা ছিল ব্রাজিল আদৌ সফল হয়েছে কি। সহায়তা ও গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো নিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে মধ্যবর্তী অবস্থান খুঁজে পেয়েছে কিনা। ব্রাজিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো ক্ষমতা নেই। সমাঝোতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কপ সম্মেলনে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে অবশ্যই জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসিসি) চুক্তিতে সই করা ১৯৭ দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সম্মতি লাগবে। ব্রাজিলের সঙ্গে দেশগুলোর সম্পর্কে জানাশোনা আছে এমন একজন পর্যবেক্ষক এএফপিকে জানিয়েছেন, কিছু দেশ আলোচনায় অংশ না নিলেও তা 'গঠনমূলক' হয়েছে।

আর্থিক দায়বদ্ধতা ও গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো নিয়ে সবচেয়ে জোর দিচ্ছে ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর জোট (এওএসআইএস)। বেলেমে কপ সম্মেলনে অংশ নেওয়া দেশগুলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ নিরাপদ মাত্রায় ধরে রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যর্থতা স্বীকার করে– এমনটাই দাবি এই জোটের। এতে সম্মতি জানিয়েছে- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী তাপমাত্রা বৃদ্ধি সর্বনিম্ন ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখাটা সম্ভব হবে না। কারণ, এই লক্ষ্য ধরে রাখার জন্য যে পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন কমানো প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করতে পারেনি। সম্মেলনে অংশ নেওয়া একজন কূটনীতিক বলেন, ব্রাজিল মোকাবিলার সাহস দেখিয়েছে। এ জন্য ব্রাজিলকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন, তেল উৎপাদনকারী ২২টি আরব দেশ গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো নিয়ে আলোচনা শুরুর জন্য ব্রাজিলের সমালোচনা করেছে। এ ছাড়া আর্থিক দায়বদ্ধতা নিয়ে আলোচনার জন্য ধনী দেশগুলোও আপত্তি জানিয়েছে।

এই বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই, তারা সমঝোতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জলবায়ু সংকটে ব্যাপক বিক্ষোভ

বাদ্যের তালে তালে চলছিল গান ও নাচ। ব্রাজিলের বেলেম শহরে হয়েছে হাজারো আদিবাসী ও জলবায়ু কর্মীর বিক্ষোভ। এ শহরেই বসেছিল জাতিসংঘের জলবায়ু বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন কপ-৩০। জলবায়ু সংকট মোকাবিলার আলোচনার মধ্যে 'গ্রেট পিপল মার্চ' নামের বিক্ষোভে সম্মেলন কেন্দ্রের ফটকে আদিবাসী ও জলবায়ু কর্মীরা জড়ো হয়েছিলেন।

বিক্ষোভে অংশ নিয়ে কেউ কেউ জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতিকী শেষকৃত্য আয়োজন করেন। কালো পোশাক পরে শোকাহত বিধবার অভিনয় করে 'কয়লা', 'তেল' ও 'গ্যাস' লেখা তিনটি কফিন বহন করেন।

২০২১ সাল গ্লাসগোতে কপ-২৬ এর পর এবারই প্রথম জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন স্থলের বাইরে জলবায়ুকর্মীদের বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর আগে তিনটি সম্মেলন এমন তিনটি দেশে হয়েছে যেখানে এভাবে বিক্ষোভের অনুমতি ছিল না।

ব্রাজিলের ফেডারেল ইউনিভার্সিটি অব প্যারার থিয়েটার গ্রুপ হাইড্রা ডান্স থেকে বিক্ষোভে শামিল হন তুগা সিন্তিয়া। তিনি বলেন, 'আমরা জীবাশ্ম জ্বালানির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আয়োজন করেছি।"

ব্রাজিলের আদিবাসী নেতা তশাই সুরুই বলেন, 'আমরা এখানে এসেছি চাপ সৃষ্টি করতে, যাতে দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।'

ব্রাজিলের হুনি কুইন আদিবাসী গোষ্ঠীর ৫০ বছর ছর বয়সী সদস্য রেনেডিতো হুনি কুইন বলেন, 'আমরা গণহত্যা প্রত্যক্ষ করছি, কারণ আমাদের বন ধ্বংস করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, 'আমরা আমাজন থেকে আমাদের কণ্ঠ তুলে ধরতে চাই এবং ফলাফল চাই। অধিকারের সুরক্ষার জন্য কপ সম্মেলনে আরো বেশি আদিবাসী প্রতিনিধির প্রয়োজন।'

বিক্ষোভকারীরা প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সরকারের কাছে জলবায়ু ক্ষতিপূরণ চাইছেন। তাঁরা চাইছেন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এ ক্ষতিপূরণ পাক। বিক্ষোভকারীদের হাতে বিশাল ফিলিস্তিনি পতাকা এবং 'ফ্রি' লেখা ব্যানারও দেখা গেছে। বেলেম শহরে সাড়ে চার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিক্ষোভ করেন ভিক্ষোভকারীরা। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ এতে অংশ নেন। সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

কপ-৩০ সভাপতি আন্দ্রে কোরেরা দো লাগো স্বীকার করেন, এক সপ্তাহ জলবায়ু আলোচনায় অগ্রগতি হয়নি।

তিনি সময় নষ্ট না করার আহ্বান জানান। লাগো বলেন, 'ঝুঁকি এতটাই বেশি এবং প্রক্রিয়াগত কৌশল বা স্থবির আলোচনা অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।"

দেশগুলো বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ ও দুর্বল লক্ষ্য নিয়ে মুখোমুখি অবস্থানে। ধনী দেশগুলোর জন্য জলবায়ু অভিযোজনে দরিদ্র দেশগুলোর তহবিল তিন গুণ বাড়ানোর দাবি নিয়ে বড় ধরনের সংঘাত।

ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য, কেনিয়াসহ কয়েকটি দেশ জীবাশ্ম জ্বালানি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার জন্য ব্রাজিলের একটি পথনকশাকে সমর্থন করেছে। যুক্তরাজ্যের জলবায়ুমন্ত্রী কেটি হোয়াইট বলেন, 'আমরা এই পথনকশাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। এ বিষয়ে ফলাফল দেখতে চাই।' তবে তিনি আরো বলেন, এমন প্রস্তাবের জন্য অধিকাংশ দেশের সমর্থন প্রয়োজন।

এসব প্রচেষ্টার বিরোধিতা করছে সৌদি আরবসহ অন্যান্য তেল উৎপাদক দেশ। এতে সম্মেলন শেষে সবার মতৈক্যে কোনো চুক্তি আদৌ সম্ভব কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ।

কপ-৩১ আয়োজন নিয়ে মতবিরোধ

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (কপ-৩১) তুরস্কের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজনের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছে অস্ট্রেলিয়া। বেলেমে বৈঠকে কপ-৩১ এর আয়োজক হতে আগ্রহ দেখিয়েছে দুই দেশ। তবে আয়োজক হওয়া নিয়ে দুই দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলছে। এ অচলাবস্থা থেকে বের হওয়ার জন্য ক্যানবেরা ও আঙ্কারার উপর চাপ বাড়ছে।

ব্রাজিল চাইছে জলবায়ু কূটনীতি এখনো কার্যকর, সেটি প্রমাণ করতে। জলবায়ু সম্মেলন আয়োজন করতে চাইলে সব দেশের সম্মতি লাগে। অস্ট্রেলিয়া বা তুরস্ক কেউই তাদের আয়োজক হওয়ার প্রস্তাব থেকে সরে না দাঁড়ালে বা যৌথ আয়োজন নিয়ে সমঝোতায় না পৌঁছালে কপ-৩১ আয়োজনের ভার পাবে জার্মানি।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ বলেন, তুরস্কের সঙ্গে যৌথ আয়োজন সম্ভব নয়। তাই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তুরস্কের একজন কূটনৈতিক বলেন, আঙ্কারা যৌথ সম্মেলনকে সমর্থন করছে। ঐকমত্য না হলে একাই আয়োজনে প্রস্তুত।

আস্ট্রেলিয়া অ্যাডিলেডে প্রতিবেশী প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যৌথভাবে সম্মেলনের আয়োজন করতে চাইছে। অস্ট্রেলিয়ার আশা, জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব পড়া অঞ্চলগুলোকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরবে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর নেতারা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন, কপ সম্মেলনে তাঁদের কণ্ঠস্বর উপেক্ষিত।

কী পেল আদিবাসী ও বনাঞ্চলের মানুষ

ব্রাজিল আমাজন বনের মাঝখানে এবাবের জলবায়ু সম্মেলন (কপ-৩০) আয়োজন করতেই জোর দিয়েছিল। লক্ষ্য উষ্ণতা রোধে চিরহরিৎ বনাঞ্চলকে আলোচনার কেন্দ্র

বিন্দুতে আনা। প্রায় সবদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা শেষে চিরহরিৎ বনে বসে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হলো, অভূতপূর্ব হলেও তা ছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়ার।

এবার সর্বোচ্চ সংখ্যক আদিবাসী প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। আগের সম্মেলনগুলোর মতো বনাঞ্চল রক্ষার পরিকল্পনায় দেশগুলো একমত হতে পারেনি; শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হয়েছে একটি স্বেচ্ছা পথরেখার উপর।

বনাঞ্চল রক্ষা করা অলাভজনক সংস্থা ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সোসাইটির জননীতিবিষয়ক বিভাগের পরিচালক কর্লোস রিটল বলেন, 'আশা ছিল, এবারের সম্মেলন থেকে আরও শক্ত ও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত। আমাজন ও গোটা বিশ্বের প্রত্যাশার প্রতিফল ঘটেনি।'

সম্মেলন শুরুর দিনে জার্মানি ঘোষণা দেয়, ব্রাজিলের নেতৃত্বে গঠিত ট্রপিক্যাল ফরেস্টস ফর এভার ফ্যাসিলিটিতে ১০০ কোটি ইউরো দেবে তারা। বৈশ্বিক বন সংরক্ষণ তহবিলে বরাদ্দ দাঁড়ায় ৭০০ কোটি ডলার। শেষ দিনে চুক্তি থেকে বাদ পড়ে ২০৩০ সালের মধ্যে বন উজাড় শূন্যে নামানো সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা।

সম্মেলনে পানামার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জুয়ান কার্লোস মন্টেরের গোমেজ। তাঁর মতে, 'এবারের সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল বনাঞ্চল সম্মেলন অর্থাৎ ফরেস্ট কপ। সম্মেলনের শেষে এসে সেটা আসলে কতটা হলো, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ।'

বেলেমে এবার বন রক্ষায় অন্য সম্মেলনের তুলনায় তহবিলের ঘোষণা এসেছে বেশি। সবচেয়ে বড় অগ্রগতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে। বিভিন্ন দেশ থেকে সর্বোচ্চ প্রায় তিন হাজার আদিবাসী নেতা এবারের সম্মেলনে অংশ নেন ।

আমাজনের ব্রাজিল অংশের আদিবাসী সংগঠনগুলোর জোট প্রধান তোয়া মানশিনেরি বলেন, আদিবাসীদের ভূমি চিহ্নিত করণকে জলবায়ু নীতি হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির দাবি আলোচ্যসূচিতে না উঠা হতাশার। আমাজনের আদিবাসী আন্দোলন হিসেবে আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ফিরছি।'

ব্রাজিলের এ সম্মেলন 'কপ-৩০' নামে পরিচিত। ব্রাজিল এতদিন শুধু ফুটবল খেলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখন পরিবেশ সম্মেলনের জন্য বিখ্যাত হলো। ব্রাজিল দেশ হিসেবে খুব বড়। দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ। এখানেই মূলত আমাজন অরণ্য অবস্থিত। ব্রাজিল বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথমে সুনাম কুড়ায়। এবার 'কপ-৩০' এ সুনাম কুড়িয়েছে। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. "মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম"– আল হাদীস। এ কথাটি অনেক মাসজিদেই লেখা থাকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।

মোশাররফ হোসেন, মতলব, চাঁদপুর

উত্তর ঃ "মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম।" – আল হাদীস

"মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা নিষেধ।" –কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের বহু মাসজিদে উপরোক্ত দুটি কথা নজরে পড়ে। কোন মাসজিদে দেখা যায়, "মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম"– আল হাদীস। আবার কোন মাসজিদে দেখা যায়, "মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা নিষেধ বা নিষিদ্ধ।" – কর্তৃপক্ষ।

প্রথম কথাটিকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ একথাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন বলে দাবী করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় কথাটি মাসজিদ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ইমাম বা মাসজিদ কমিটির নিষেধাজ্ঞা।

এবার আমরা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটি কথার বিশ্লেষণ করব। প্রথম কথাটিকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু হাদীসের কিতাবসমূহে একথাটির কোন হদিস পাওয়া যায় না। কাজেই যে বা যারা একথাটিকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন বা মাসজিদে ঝুলিয়ে বা সেঁটে দিয়েছেন কিংবা যারা সেটাকে এখনো মাসজিদে বহাল রেখেছেন তাদের কর্তব্য হবে এটি হাদীসের কোন্ গ্রন্থে আছে এবং এটি সহীহ হাদীস না বানানো কথা, তা অবশ্যই তারা খুঁজে বের করবেন। হাদীস হলে যে গ্রন্থের হাদীস তার নাম লিখে দেবেন। এটি যদি হাদীস না হয়, অথবা এটি হাদীস কিনা হাদীসের কিতাব খুঁজে তা বের করার মত সুযোগ যদি তাদের (মাসজিদের বর্তমান ইমাম বা মাসজিদ কমিটির সদস্যদের) না থাকে তাহলে তারা অবশ্যই একথাটিকে মাসজিদ থেকে সরিয়ে ফেলবেন। অন্যথায় তাদের বিরাট বড় গুনাহগার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ তারা এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, অথচ এটা হাদীস হওয়ার কোনই প্রমাণ তাদের কাছে নেই। বরং এটা হাদীস না হওয়ারই সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

রাসূলের (সা) হাদীস নয় এমন কোন কথাকে যারা হাদীস বলে চালিয়ে দেন, তাদের সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল।" (সহীহ আল বুখারী)

এ হাদীস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা) যে কথা বলেননি, সেটাকে হাদীস হিসেবে চালিয়ে দেয়া বা হাদীস বলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, হারাম ও কবীরা গুনাহ। কাজেই

রাসূলের (সা) হাদীস হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে কোন কথাকে হাদীস বলা মোটেই উচিত নয়।

দ্বিতীয় কথা ঃ "মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা নিষিদ্ধ"। – কর্তৃপক্ষ

এটা চরম অন্যায় ও গর্হিত কথা। মাসজিদ আল্লাহর ঘর। তাঁর ঘরে কোন্ কথা বলা যাবে আর কোন্ কথা বলা যাবে না চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তা ঠিক করে দিয়েছেন। তাঁরা মাসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য এ কাজটি ফেলে রেখে যাননি। এমতাবস্থায় মাসজিদ কর্তৃপক্ষের মাসজিদে কোন কথা বলা নিষিদ্ধ করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও অনধিকার চর্চা করার শামিল, কাজেই কোন মাসজিদে এরূপ কোন লেখা থাকলে সেই মাসজিদের কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হবে অবিলম্বে তা সরিয়ে ফেলা। অন্যথায় তাদের মাসজিদ কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন না করার কারণে গুনাহগার হওয়ার আশংকা রয়েছে।

তৃতীয় বিশ্লেষণ ঃ "মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম বা নিষিদ্ধ" এ বাক্যে দুনিয়াবী কথাকে কোন বিশেষণ দ্বারা খাস বা নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং সাধারণভাবে দুনিয়াবী কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এ বাক্যটি দ্বারা দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সব কথাকেই মাসজিদে বলা হারাম করা হয়েছে।

অথচ ইসলাম মানব জীবনকে এবং মানুষের কথা ও কাজকে দীনী ও দুনিয়াবী এ দু'ভাগে বিভক্ত করেনি। ইসলাম বিভক্ত করেছে হারাম-হালাল, জায়েয-নাজায়েয, মাকরূহ-মুস্তাহাব ও মুবাহ প্রভৃতি। মানুষের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজ আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা মুতাবিক হলে তা হবে সাওয়াবের কাজ। মানুষের এরূপ কোন কাজ দীন বহির্ভূত নয়। মানুষের অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষ-বাস, লেন-দেন, আচার-আচরণ, কায়-কারবার, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি প্রভৃতি এমনকি পেশাব-পায়খানাও আল্লাহর বিধান ও রাসূলের তরীকা মুতাবিক হলে দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও তা ইসলামী কাজ ও ইসলামী জীবনাচার হিসেবেই গণ্য হবে। এসব বিষয়ে মাসজিদের বাইরে যেমন আলোচনা করা বা কথা বলা জায়েয তেমনি মাসজিদের ভিতরেও জায়েয। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে নববীতে বসে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কাজের পরিকল্পনা করতেন এবং মাসজিদে নববীতে বসেই তিনি মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনা করতেন। মাসজিদে নববী ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকেই মুসলমানদের সব কাজ পরিচালনা করা হতো। দীনী ও দুনিয়াবী এ দু'ভাগে বিভক্ত করা ইসলামের দৃষ্টিকোণ নয়। ইসলাম মানব জীবনকে এভাবে বিভক্ত করেনি। ইসলাম যেমন মানব জীবনের সকল কাজ, সকল দিক ও বিভাগের বিধান দিয়েছে তেমনি সেসব বিষয়ে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মাসজিদে আলোচনা করা ও কথা বলাকেও জায়েয করেছেন। তবে মাসজিদে কয়েকটি কাজ করতে রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন, সেসব কাজ মাসজিদে

করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। যেমন কেনা-বেচা করা, হারানো জিনিসের ঘোষণা দেয়া ইত্যাদি।

এছাড়াও "মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম" একথাটির মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের আভাস রয়েছে। তা হলো ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মাসজিদকে কেবল নামায, কুরআন তিলাওয়াত ও যিকর-আযকারের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখা, ইসলামের সামগ্রিক জীবন সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়া থেকে এবং ইসলামের প্রকৃত আহ্বানকারীগণকে মাসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা।

অতএব "মাসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হারাম"– একথাটি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনাদর্শ এবং ইসলামের দৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণের সাথে সাংঘর্ষিক। সুতরাং একথাটিকে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মাসজিদে ঝুলিয়ে রাখা বা দেয়ালের সাথে সেঁটে রাখা কোন দিক দিয়েই সঠিক নয়। অবশ্য এটি যদি সহীহ হাদীস হিসেবে প্রমাণিত হয় তাহলে সকল মুসলমান তা মাথা পেতে নিতে বাধ্য। তবে এটাকে হাদীস হিসেবে প্রমাণ করার দায়িত্ব তাদের যারা এটাকে হাদীস বলে মাসজিদে ঝুলিয়ে রাখেন। অন্যথায় তাদেরই কর্তব্য হবে এটাকে মাসজিদ থেকে সরিয়ে ফেলা।

প্রশ্ন-২. পচনশীল ফলের ও শাক-সবজির উপর উশর আদায় করার বিধান কি?

নূর মোহাম্মদ, রাজশাহী

উত্তর ঃ আম, কাঠাল, জাম বা এ জাতীয় পচনশীল ফল এবং শাক-সবজির উশর আদায় করা ফরয কিনা এ ব্যাপারে প্রাচীন ফকীহ ও ইমামগণের মধ্যে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ) এর মতে ভূমিতে উৎপাদিত সব ধরনের ফসল শাক-সবজি ও ফলের উশর (যাকাত) আদায় করা ফরয। এসব ফসল পচনশীল হোক বা না হোক এবং এর পরিমাণ যাই হোক, উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ– যদি বৃষ্টির পানিতে উৎপাদিত হয় অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ যদি সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়– যাকাত হিসেবে আদায় করা ফরয।

হানাফী মাযহাবের অপর দুজন ইমাম এবং ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মতে পচনশীল ফসল, শাক-সবজি ও পচনশীল ফলের যাকাত আদায় করতে হবে না। অনুরূপভাবে ফসলের পরিমাণ পাঁচ অসাক অর্থাৎ সেরের ওজনে বিশ মতান্তরে সাড়ে ছাব্বিশ মণের কম ফসলেরও যাকাত আদায় করতে হবে না। এ মতে যেসব ফসল রাখা যায় এবং ওজন বা (পাত্র দ্বারা) পরিমাপ করা হয় এবং তার পরিমাণ বিশ মতান্তরে সাড়ে ছাব্বিশ মণ বা তার চাইতে বেশী হয় তার যাকাত আদায় করা ফরয।

উভয় মতের পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল রয়েছে। কাজেই যে কোন একটি মতের ওপর আমল করা যেতে পারে।

• ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বই পরিচিতি

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

বইয়ের নাম : **ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) জীবন, চিন্তাধারা ও সংস্কার সমূহ**

লেখক : **ড. মোহাম্মদ ছামিউল হক ফারুকী**

পৃষ্ঠা : ৪৪৮, মূল্য : ৪৪০/- টাকা

প্রকাশক : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

ইসলামে অনুপ্রবিশষ্ট শির্ক বিদাত দূর করে যে কজন মনীষী মুসলিম সমাজের সংস্কার চেষ্টা করেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন ইবনুল কায়্যিম (রহ)। তার পুরো নাম- মুহাম্মাদ ইবনু আবি বাকর ইবনুল কায়্যিম (রহ) আল জাওজিয়া। ৭১২ হিজরীতে আরেক সংস্কারক ও বিদ্বান ইমাম ইবনু তাইমিয়ার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁর ছাত্র গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১৬ বছর এ শিক্ষক আর ছাত্র একত্রে অবস্থান করেন। সেজন্য উভয়ের চিন্তা-চেতনা, উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি প্রায় একই ধারায় সমান্তরালে প্রবাহিত হয়। তাই সংস্কারক হিসেবে ইবনু তাইমিয়ার যতটুকু পরিচিতি ও প্রসিদ্ধি ঠিক তেমনিভাবে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) ও ততটুকু পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

প্রসিদ্ধ এ মনীষীর জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন লেখক, গবেষক, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, ড. মুহাম্মদ ছামিউল হক ফারুকী। ইতিমধ্যে তার বেশ কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রতিটি গ্রন্থই পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে। আশা করি এ গ্রন্থটিও পাঠক প্রিয়তা পাবে। কারণ এই মনীষীর জীবনী গ্রন্থটি এত তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে, অগ্রসর পাঠকগণ এ থেকে উপকৃত হতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

বইটিতে মোট তিনটি অধ্যায়ে একুশটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে চারটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। যেখানে ইমনুল কাইয়্যিম (রহ) এর জন্ম, শিক্ষা, কর্মজীবন ও চরিত্রমাধুরী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১১টি পরিচ্ছদের মাধ্যমে তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, শরঈ বিধান প্রণয়নে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) এর মূলনীতি, সুন্নাহর অবস্থান ও আইনগত মর্যাদা, সাহাবীগণের অনুসরণ, মুরসাল ও জয়ীফ হাদিসের অবস্থানগত মর্যাদা, কিয়াস, কার্যকারণ ও হিকমাহ্ এর বিবরণ, ইসলামী শরী'আর বৈশিষ্ট্য, রায় বা অভিমত, আইন ও বিচার, সংস্কারের বিষয়ে ইবনুল কাইয়্যিম এর চিন্তাধারা, জিহাদ ও যুদ্ধনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা এবং ইবনুল কাইয়্যিম এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা। তৃতীয় অধ্যায়ের ছয়টি পরিচ্ছেদে ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) এর সংস্কার সমূহের আলোচনা করা হয়েছে। বইটি যেমন গবেষকদের কাজে লাগবে, তেমনি সাধারণ পাঠকদেরও নিরাশ করবে না। প্রতিটি পাঠকের খোরাক রয়েছে।

বইটির বাঁধাই অত্যন্ত মজবুত। প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন। কাগজ ও ছাপার মান ভালো।

বইয়ের মান বিচারে দামটাকে বেশি বলা চলে না। দামের উপর অবশ্যই ডিসকাউন্ট রয়েছে। যারা ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন লাইব্রেরীতে বইটি সংগ্রহ করতে চান তারা চোখ বুজে বইটি ক্রয় করতে পারেন। ■